র ক্তে র দা গ

এক

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম বসন্তঋতু আসিয়াছে। দক্ষিণ হইতে ঝিরঝির বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কলিকাতা শহরের এখানে-ওখানে যে দুই চারিটা শহুরে গাছ আছে তাহাদের অঙ্গেও আরক্তিম নব-কিশলয়ের রোমাঞ্চ ফুটিয়াছে। শুনিয়াছি এই সময় মনুষ্যদেহের গ্রন্থিগুলিতেও নূতন করিয়া রসসঞ্চার হয়।

ব্যোমকেশ তক্তপোশের উপর কাত হইয়া শুইয়া কবিতার বই পড়িতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল। আজকাল বসন্তকালের সমাগম হইলেই মনটা কেমন উদাস হইয়া যায়। বয়স বাড়িতেছে।

সন্ধ্যার মুখে সত্যবতী আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম সে চুল বাঁধিয়াছে, খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়াইয়াছে, পরনে বাসন্তী রঙের হাল্কা শাড়ি। অনেক দিন তাহাকে সাজগোজ করিতে দেখি নাই। সে তক্তপোশের পাশে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে ব্যোমকেশকে বলিল, 'কী রাতদিন বই মুখে করে পড়ে আছ। চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি গিয়ে।'

ব্যোমকেশ সাড়া দিল না। আমি প্রশ্ন করিলাম, 'কোথায় বেড়াতে যাবে ? গড়ের মাঠে ?'

সত্যবতী বলিল, 'না না, কলকাতার বাইরে। এই ধরো—কাশ্মীর—কিম্বা—'

ব্যোমকেশ বই মুড়িয়া আস্তে-আস্তে উঠিয়া বসিল, থিয়েটারী ভঙ্গীতে ডান হাত প্রসারিত করিয়া বিশুদ্ধ মন্দাক্রান্তা ছন্দে আবৃত্তি করিল—

> 'ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ গমনে
> কিন্তু পাথেয় নাস্তি
> পায়ে শিক্‌লি মন উড়ুউড়ু
> একি দৈবের শাস্তি।'

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, 'এটা কোত্থেকে পেলে ?'

'হুঁ হুঁ—বলব কেন ?' ব্যোমকেশ আবার কাত হইয়া বই খুলিল।

হাতে কাজ না থাকিলে লোকে জ্যাঠার গঙ্গাযাত্রা করে, ব্যোমকেশ বাংলা সাহিত্যের পুরানো কবিদের লইয়া পড়িয়াছিল ; ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কবিকে একে একে শেষ করিতেছিল। ভয় দেখাইয়াছিল, অতি আধুনিক কবিদেরও সে ছাড়িবে না। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কোন দিন হয়তো নিজেই কবিতা লিখিতে শুরু করিয়া দিবে। আজকাল ছন্দ ও মিলের বালাই ঘুচিয়া যাওয়ায় কবিতা লেখার আর কোনও অন্তরায় নেই। কিন্তু সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ কবিতা লিখিলে তাহা যে কিরূপ মারাত্মক বস্তু দাঁড়াইবে ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়। সেই যে খোকাকে একখানা 'আবোল তাবোল' কিনিয়া দিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের কাব্যিক প্রেরণার মূল সেইখানে। তারপর বইয়ের দোকানের অংশীদার হইয়া

গোদের উপর বিষফোড়া হইয়াছে।

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে একটি মোচড় দিয়া বলিল, 'ওঠ না। আবার শুলে কেন?'

ব্যোমকেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'কাশ্মীর যেতে কত খরচ জান?'

'কত?'

'অন্তত এক হাজার টাকা। অত টাকা পাব কোথায়?'

সত্যবতী রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'জানি না আমি ওসব। যাবে কি না বল।'

'বললাম তো টাকা নেই।'

এই সময় বহির্দ্বারে টোকা পড়িল। বেশ একটি উপভোগ্য দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত হইতেছিল, বাধা পড়িয়া গেল। সত্যবতী ব্যোমকেশকে কোপ-কটাক্ষে আধপোড়া করিয়া দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরের আলো জ্বালিয়া দ্বার খুলিলাম। যে লোকটি দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া সহসা কিশোরবয়স্ক মনে হয়। বেশি লম্বা নয়, ছিপছিপে পাতলা গড়ন, গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখে অল্প গোঁফের রেখা। বেশবাশ পরিপাটি, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতা হইতে গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি সমস্তই অনবদ্য।

'কাকে চান?'

'সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবুকে।'

'আসুন।' দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম।

লোকটি ঘরে প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর সম্মুখে দাঁড়াইলে তাহার চেহারাখানা ভাল করিয়া দেখিলাম। যতটা কিশোর মনে করিয়াছিলাম ততটা নয়; বর্ণচোরা আম। চোখের দৃষ্টিতে দুনিয়াদারির ছাপ পড়িয়াছে, চোখের কোলে সূক্ষ্ম কালির আঁচড়, মুখের বাহ্য সৌকুমার্যের অন্তরালে হাড়ে পাক ধরিয়াছে। তবু বয়স বোধ করি পঁচিশের বেশি নয়।

ব্যোমকেশ তক্তপোশের পাশে বসিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। সামনের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, 'বসুন। কী দরকার আমার সঙ্গে?'

লোকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, 'আপনাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, 'তাই নাকি! কাজটা কী?'

যুবক পাশের পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিল, ব্যোমকেশের সম্মুখে অবহেলাভরে সেগুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, আপনি আমার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করবেন। এই কাজ। পরে আপনার পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হবে না, তাই আগাম দিয়ে যাচ্ছি। এক হাজার টাকা গুনে নিন।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কুঞ্চিত চক্ষে যুবকের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নোটের তাড়া গুনিয়া দেখিল। একশত টাকার দশ কেতা নোট। নোটগুলিকে টেবিলের এক পাশে রাখিয়া ব্যোমকেশ অলসভাবে একবার আমার পানে চোখ তুলিল; তাহার চোখের মধ্যে একটু হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল। তারপর সে যুবকের মুখের উপর গম্ভীর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনার কাজ নেব কিনা তা নির্ভর করবে আপনার উত্তরের ওপর।'

যুবক সোনার সিগারেট কেস খুলিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে ধরিল, ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া

প্রত্যাখ্যান করিল। যুবক তখন নিজে সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, 'প্রশ্ন করুন। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর না দিতেও পারি।'

ব্যোমকেশ একটু নীরব রহিল, তারপর অলসকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'আপনার নাম কী ?'

যুবকের মুখে চকিত হাসি খেলিয়া গেল। হাসিটি বেশ চিত্তাকর্ষক। সে বলিল, 'নামটা এখনও বলা হয়নি। আমার নাম সত্যকাম দাস।'

'সত্যকাম ?'

'হ্যাঁ ! আপনি যেমন সত্যান্বেষী, আমি তেমনি সত্যকাম।'

'এ-নাম আগে শুনিনি। সত্যকাম ছদ্মনাম নয় তো ?'

'না, আসল নাম।'

'হুঁ। আপনি কোথায় থাকেন ? ঠিকানা কি ?'

'কলকাতায় থাকি। ৩৩/৩৪ আমহার্স্ট স্ট্রীট।'

'কী কাজ করেন।'

'কাজ ? বিশেষ কিছু করি না। দাস-চৌধুরী কোম্পানির সুচিত্রা এম্পোরিয়মের নাম শুনেছেন ?'

'শুনেছি। ধর্মতলা স্ট্রীটের বড় মনিহারী দোকান।'

'আমি সুচিত্রা এম্পোরিয়মের অংশীদার।'

'অংশীদার।—অন্য অংশীদার কে ?'

সত্যকাম একবার দম লইয়া বলিল, 'আমার বাবা—উষাপতি দাস।'

ব্যোমকেশ সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া রহিল। সত্যকাম তখন ক্ষণেকের জন্য ইতস্তত করিয়া অনিচ্ছাভরে বলিল, 'আমার মাতামহ সুচিত্রা এম্পোরিয়মের পত্তন করেছিলেন, পরে আমার বাবা তাঁর পার্টনার হন। এখন দাদামশাই মারা গেছেন, তাঁর অংশ আমাকে দিয়ে গেছেন। আমার মা দাদামশায়ের একমাত্র সন্তান। আমিও মায়ের একমাত্র সন্তান।'

'বুঝেছি।' ব্যোমকেশ ক্ষণকাল যেন অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, তারপর নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি মদ খান ?'

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া সত্যকাম বলিল, 'খাই। গন্ধ পেলেন বুঝি ?'

'আপনার বয়স কত ?'

'একুশ চলছে। জন্ম-তারিখ জানতে চান ? ৭ই জুলাই, ১৯২৭।' সত্যকাম বাঙ্গবঙ্কিম হাসিল।

'কতদিন মদ খাচ্ছেন ?'

'চৌদ্দ বছর বয়সে মদ ধরেছি।' সত্যকাম নিঃশেষিত সিগারেটের প্রান্ত হইতে নূতন সিগারেট ধরাইল।

'সব সময় মদ খান ?'

'যখন ইচ্ছে হয় তখনই খাই।' বলিয়া সে পকেট হইতে চার আউন্সের একটি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া দেখাইল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। আমিও নির্বাকভাবে এই একুশ বছরের ছোকরাকে দেখিতে লাগিলাম। যাহারা সর্বাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রিভুবন বিজয়ী হইতে চায়, তাহারা বোধকরি খুব অল্প বয়স হইতেই সাধনা আরম্ভ করে।

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া পূর্ববৎ নির্বিকার স্বরে বলিল, 'আপনার আনুষঙ্গিক দোষও আছে ?'

সত্যকাম মুচকি হাসিল, 'দোষ কেন বলছেন, ব্যোমকেশবাবু ? এমন সর্বজনীন কাজ-কি

দোষের হতে পারে ?'

আমার গা রি-রি করিয়া উঠিল। ব্যোমকেশ কিন্তু নির্বিকার মুখেই বলিল, 'দার্শনিক আলোচনা থাক। ভদ্রঘরের মেয়েদের উপরেও নজর দিয়েছেন ?'

'তা দিয়েছি।' সত্যকামের কণ্ঠস্বরে বেশ একটু তৃপ্তির আভাস পাওয়া গেল।

'কত মেয়ের সর্বনাশ করেছেন ?'

'হিসাব রাখিনি, ব্যোমকেশবাবু।' বলিয়া সত্যকাম নির্লজ্জ হাসিল।

ব্যোমকেশ মুখের একটা অরুচিসূচক ভঙ্গী করিল, 'আপনি বলছেন হঠাৎ আপনার মৃত্যু হতে পারে। কেউ আপনাকে খুন করবে, এই কি আপনার আশঙ্কা ?'

'হ্যাঁ।'

'কে খুন করতে পারে ? যে-মেয়েদের অনিষ্ট করেছেন তাদেরই আত্মীয়স্বজন ? কাউকে সন্দেহ করেন ?'

'সন্দেহ করি। কিন্তু কারুর নাম করব না।'

'প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টাও করবেন না ?'

সত্যকাম মুখের একটা বিমর্ষ ভঙ্গী করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, 'চেষ্টা করে লাভ নেই, ব্যোমকেশবাবু। আচ্ছা আজ উঠি, আর বোধহয় আপনার কোন প্রশ্ন নেই। রাত্তিরে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে ব্যবসায়ঘটিত নয় তাহা তাহার বাঁকা হাসি হইতে প্রমাণ হইল।

সে দ্বারের কাছে পৌঁছিলে ব্যোমকেশ পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে যদি কেউ খুন করে আমি জানব কী করে ?'

সত্যকাম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'খবরের কাগজে পাবেন। তা ছাড়া আপনি খোঁজ খবর নিতে পারেন। বেশি দিন বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে না।'

সত্যকাম প্রস্থান করিলে আমি দরজা বন্ধ করিয়া তক্তপোশে আসিয়া বসিলাম। সত্যবতী হাসি-ভরা মুখে পুনঃপ্রবেশ করিল। মনে হইল সে দরজার আড়ালেই ছিল।

'এক হাজার টাকার জন্যে ভাবছিলে, পেলে তো এক হাজার টাকা !'

ব্যোমকেশ বিরস মুখে নোটগুলি সত্যবতীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'পিপীলিকা খায় চিনি, চিনি যোগান্ চিন্তামণি। আর কি, এবার কাশ্মীর যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দাও।' আমাকে বলিল, 'কেমন দেখলে ছোকরাকে ?'

বলিলাম, 'এত কম বয়সে এমন দু'-কানকাটা বেহায়া আগে দেখিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও না। কিন্তু আশ্চর্য, নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায় না, মরার পর অনুসন্ধান করাতে চায় !'

দুই

পরদিন সকালবেলা সত্যবতী বলিল, 'কাশ্মীর যে যাবে, লেপ বিছানা কৈ ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কেন, গত বছর পাটনায় তো ছিল !'

সত্যবতী বলিল, 'সে তো সব দাদার। আমাদের কি কিছু আছে ! নেহাত কলকাতার শীত, তাই চলে যায়। কাশ্মীর যেতে হলে অন্তত দুটো বিলিতি কম্বল চাই আর আমার জন্যে একটা বীভার-কোট।'

'হুঁ। চল অজিত, বেরুনো যাক।'

প্রশ্ন করিলাম, 'কোথায় যাবে ?'

সে বলিল, 'চল, সুচিত্রা এম্পোরিয়মে যাই। রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে।'

বলিলাম, 'সত্যবতীও চলুক না, নিজে পছন্দ করে কেনাকাটা করতে পারবে।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীর পানে তাকাইল, সত্যবতী করুণ স্বরে বলিল, 'যেতে তো ইচ্ছে করছে, কিন্তু যাই কী করে ? খোকার ইস্কুলের গাড়ি আসবে যে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার যাবার দরকার নেই। আমি তোমার জিনিস পছন্দ করে নিয়ে আসব। দেখো, অপছন্দ হবে না।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, ব্যোমকেশের পছন্দের উপর তাহার যে অটল বিশ্বাস আছে তাহাই জানাইয়া গেল। সত্যবতীর শৌখিন জিনিসের কেনাকাটা অবশ্য চিরকাল আমিই করিয়া থাকি। কিন্তু এখন বসন্তকাল পড়িয়াছে, ফাল্গুন মাস চলিতেছে—

দু'জনে বাহির হইলাম। সাড়ে ন'টার সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে পৌঁছিয়া দেখিলাম এম্পোরিয়মের দ্বার খুলিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আস্ত কাচের জানালা হইতে পর্দা সরিয়া গিয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিশাল ঘর, মোজেয়িক মেঝের উপর ইতস্তত নানা শৌখিন পণ্যের শো-কেস সাজানো রহিয়াছে। দুই চারিজন গ্রাহক ইতিমধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মহিলা। কর্মচারীরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া ক্রেতাদের মন যোগাইতেছে। একটি প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক ঘরের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পদচারণ করিতে করিতে সর্বত্র নজর রাখিয়াছেন।

আমরা প্রবেশ করিলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের কাছে আসিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন, 'আসতে আজ্ঞা হোক। কী চাই বলুন ?'

ব্যোমকেশ ঘরের এদিক ওদিক তাকাইয়া কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, 'সামান্য জিনিস—গোটা দুই বিলিতি কম্বল। পাওয়া যাবে কি ?'

'নিশ্চয়। আসুন আমার সঙ্গে।' ভদ্রলোক আমাদের একদিকে লইয়া চলিলেন, 'আর কিছু ?'

'আর একটা মেয়েদের বীভার-কোট।'

'পাবেন। এই যে লিফ্‌ট—ওপরে কম্বল বীভার-কোট দুইই পাবেন।'

ঘরের কোণে একটি ছোট লিফ্‌ট ওঠা-নামা করিতেছে, আমরা তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই পিছন হইতে কে বলিল, 'আমি এঁদের দেখছি।'

পরিচিত কণ্ঠস্বরে পিছু ফিরিয়া দেখিলাম—সত্যকাম। সিল্কের স্যুট পরা ছিমছাম চেহারা, এতক্ষণ সে বোধহয় এই ঘরেই ছিল, বিজাতীয় পোশাকের জন্য লক্ষ্য করি নাই। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ও—আচ্ছা। তুমি এঁদের ওপরে নিয়ে যাও, এঁরা বিলিতি কম্বল আর বীভার-কোট কিনবেন।' বলিয়া আমাদের দিকে একটু হাসিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যকামের দিকে একবার প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'ইনি আপনার—'

সত্যকাম মুখ টিপিয়া হাসিল, 'পার্টনার।'

'অর্থাৎ—বাবা !'

সত্যকাম ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

এতক্ষণ প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়াও লক্ষ্য করি নাই, এখন ভাল করিয়া দেখিলাম। তিনি

অদূরে দাঁড়াইয়া অন্য একজন গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে অস্বচ্ছন্দভাবে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিলেন। শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি চওড়া কাঠামোর মানুষ, চিবুকের হাড় দৃঢ়। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, রগের চুলে ঈষৎ পাক ধরিয়াছে। দোকানদারির লৌকিক শিষ্টতা সত্ত্বেও মুখে একটা তপঃকৃশ রুক্ষতার ভাব। দোকানদারির অবকাশে ভদ্রলোকের মেজাজ বোধ করি একটু কড়া।

এই সময় লিফ্‌ট নামিয়া আসিল, আমরা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইলাম।

সত্যকাম ব্যোমকেশের দিকে চটুল ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'সত্যি কিছু কিনবেন? না সরেজমিন তদারকে বেরিয়েছেন?'

'সত্যি কিনব।'

উপরতলাটি নীচের মত সাজান নয়, অনেকটা গুদামের মত। তবু এখানেও গুটিকয়েক ক্রেতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সত্যকাম আমাদের যে-দিকে লইয়া গেল সে-দিকটা গরম কাপড়-চোপড়ের বিভাগ। সত্যকামের ইঙ্গিতে কর্মচারী অনেক রকম বিলিতি কম্বল বাহির করিয়া দেখাইল। এ-সব ব্যাপারে ব্যোমকেশ চিটা ও চিনির প্রভেদ বোঝে না, আমিই দুইটি কম্বল বাছিয়া লইলাম। দাম বিলক্ষণ চড়া, কিন্তু জিনিস ভাল।

অতঃপর বীভার-কোট। নানা রঙের—নানা মাপের কোট—সবগুলিই অগ্নিমূল্য। আমরা সেগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি দেখিয়া সত্যকাম বলিল, 'মাপের কথা ভাবছেন? বীভার-কোট একটু ঢিলেঢালা হলেও ক্ষতি হয় না। যেটা পছন্দ হয় আপনার নিয়ে যান, যদি নেহাত বেমানান হয় বদলে দেব।'

একটি গাঢ় বেগুনী রঙের কোট আমার পছন্দ হইল, কিন্তু দামের টিকিট দেখিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলাম। সত্যকাম অবস্থা বুঝিয়া বলিল, 'দামের জন্যে ভাববেন না। ওটা সাধারণ খরিদ্দারের জন্যে। আপনারা খরিদ দামে পাবেন।—আসুন।'

আমাদের ক্যাশিয়ারের কাছে লইয়া গিয়া সত্যকাম বলিল, 'এই জিনিসগুলো খরিদ দরে দেওয়া হচ্ছে। ক্যাশমেমো কেটে দিন।'

'যে আজ্ঞা।' বলিয়া বৃদ্ধ ক্যাশিয়ার ক্যাশমেমো লিখিয়া দিল। দেখিলাম টিকিটের দামের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ টাকা কম হইয়াছে। মন খুশি হইয়া উঠিল; গত রাত্রে সত্যকাম সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল তাহাও বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হইল। নাঃ, আর যাই হোক, ছোকরা একেবারে চুমুণ্ডি চামার নয়।

এই সময় উপরতলায় একটি তরুণীর আবির্ভাব হইল। বরবর্ণিনী যুবতী, সাজ পোশাকে লীলা-লালিত্যের পরিচয় আছে। সত্যকাম একবার ঘাড় ফিরাইয়া তরুণীকে দেখিল; তাহার মুখের চেহারা বদলাইয়া গেল। সে এক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া আমাদের বলিল, 'আপনাদের বোধহয় আর কিছু কেনার নেই? আমি তাহলে—নতুন গ্রাহক এসেছে—আচ্ছা নমস্কার।'

মধুগন্ধে আকৃষ্ট মৌমাছির মত সত্যকাম সিধা যুবতীর দিকে উড়িয়া গেল। আমরা জিনিসপত্র প্যাক করাইয়া যখন নীচে নামিবার উপক্রম করিতেছি, দেখিলাম সত্যকাম যুবতীকে সম্পূর্ণ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, যুবতী সত্যকামের বচনামৃত পান করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে।

বাসায় ফিরিয়া সত্যবতীকে আমাদের খরিদ দেখাইলাম। সত্যবতী খুবই আহ্লাদিত হইল এবং নির্বাচন-নৈপুণ্যের সমস্ত প্রশংসা নির্বিচারে ব্যোমকেশকে অর্পণ করিল। বসন্তকালের এমনই মহিমা!

আমি যখন জিনিসগুলির মূল্য হ্রাসের কথা বলিলাম তখন সত্যবতী বিগলিত হইয়া বলিল,

'অ্যাঁ—সত্যি। ভারী ভাল ছেলে তো সত্যকাম!'

ব্যোমকেশ উর্ধ্বদিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'ভারী ভাল ছেলে। সোনার চাঁদ ছেলে! যদি কেউ ওকে খুন না করে, দোকান শীগ্‌গিরই লাটে উঠবে।'

সন্ধ্যাবেলা ব্যোমকেশ আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। এবার গতি আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে। ৩৩/৩৪ নম্বর বাড়ির সম্মুখে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। প্রদোষের এই সময়টিতে কলিকাতার ফুটপাথেও ক্ষণকালের জন্য লোক-চলাচল কমিয়া যায়, বোধ করি রাস্তার আলো জ্বলার প্রতীক্ষা করে। আমরা উদ্দিষ্ট বাড়ির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। বেশি পথিক নাই, কেবল গায়ে চাদর-জড়ানো একটি লোক ফুটপাথে ঘোরাফেরা করিতেছিল, আমাদের দেখিয়া একটু দূরে সরিয়া গেল।

৩৩/৩৪ নম্বর বাড়ি একেবারে ফুটপাথের উপর নয়। প্রথমে একটি ছোট লোহার ফটক, ফটক হইতে গলির মত সরু ইট-বাঁধানো রাস্তা কুড়ি-পঁচিশ ফুট গিয়া বাড়ির সদরে ঠেকিয়াছে। দোতলা বাড়ি, সম্মুখ হইতে খুব বড় মনে হয় না। সদর দরজার দুই পাশে দুইটি জানালা, জানালার মাথার উপর দোতলায় দুইটি গোলাকৃতি ব্যালকনি। বাড়ির ভিতরে এখনও আলো জ্বলে নাই। ফুটপাথে দাঁড়াইয়া মনে হইল একটি স্ত্রীলোক দোতলার একটি ব্যালকনিতে বসিয়া বই পড়িতেছে কিংবা সেলাই করিতেছে। ব্যালকনির ঢালাই লোহার রেলিঙের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখা গেল।

'ব্যোমকেশবাবু!'

পিছন হইতে অতর্কিত আহ্বানে দু'জনেই ফিরিলাম। গায়ে চাদর-জড়ানো যে লোকটিকে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছিলাম, সে আমাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুষ্টকায় যুবক, মাথায় চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখখানা যেন চেনা-চেনা মনে হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কে?'

যুবক বলিল, 'আমাকে চিনতে পারলেন না স্যার? সেদিন সরস্বতী পুজোর চাঁদা নিতে গিয়েছিলাম। আমার নাম নন্দ ঘোষ, আপনার পাড়াতেই থাকি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মনে পড়েছে। তা তুমি ও-পাড়ার ছেলে, ভর সন্ধ্যেবেলা এখানে ঘোরাঘুরি করছ কেন?'

'আজ্ঞে—' নন্দ ঘোষের একটা হাত চাদরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চাদরের মধ্যে লুকাইল। তবু দেখিয়া ফেলিলাম, হাতে একটি ভিন্দিপাল। অর্থাৎ দেড় হেতে খেঁটে। বস্তুটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বলবান ব্যক্তির হাতে মারাত্মক অস্ত্র। ব্যোমকেশ সন্দিগ্ধ নেত্রে নন্দ ঘোষকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কী মতলব বল দেখি?'

'মতলব—আজ্ঞে' নন্দ একটু কাছে ঘেঁষিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'আপনাকে বলছি স্যার, এ-বাড়িতে একটা ছোঁড়া থাকে, তাকে ঠ্যাঙাব।'

'তাই নাকি! ঠ্যাঙাবে কেন?'

'কারণ আছে স্যার। কিন্তু আপনারা এখানে কী করছেন? এ-বাড়ির কাউকে চেনেন নাকি?'

'সত্যকামকে চিনি। তাকেই ঠ্যাঙাতে চাও—কেমন?'

'আজ্ঞে—' নন্দ একটু বিচলিত হইয়া পড়িল, 'আপনার সঙ্গে কি ওর খুব ঘনিষ্ঠতা আছে নাকি?'

'ঘনিষ্ঠতা নেই। কিন্তু জানতে চাই ওকে কেন ঠ্যাঙাতে চাও। ও কি তোমার কোনও অনিষ্ট করেছে?'

'অনিষ্ট—সে অনেক কথা স্যার। যদি শুনতে চান, আমার সঙ্গে আসুন ; কাছেই ভূতেশ্বরের আখড়া, সেখানে সব শুনবেন।'

'ভূতেশ্বরের আখড়া !'

'আজ্ঞে আমাদের ব্যায়াম সমিতি। কাছেই গলির মধ্যে। চলুন।'

'চল।'

ইতিমধ্যে রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। আমরা নন্দকে অনুসরণ করিয়া একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিছু দূর গিয়া একটি পাঁচিলঘেরা উঠানের মত স্থানে পৌঁছিলাম। উঠানের পাশে গোটা দুই নোনাধরা জীর্ণ ঘরে আলো জ্বলিতেছে। উঠান প্রায় অন্ধকার, সেখানে কয়েকজন কপনিপরা যুবক ডন-বৈঠক দিতেছে, মুগুর ঘুরাইতেছে এবং আরও নানা প্রকারে দেহযন্ত্রকে মজবুত করিতেছে। নন্দ পাশ কাটাইয়া আমাদের ঘরে লইয়া গেল।

ঘরের মেঝেয় সতরঞ্চি পাতা ; একটি অতিকায় ব্যক্তি বসিয়া আছেন। নন্দ পরিচয় করাইয়া দিল, ইনি ব্যায়াম সমিতির ওস্তাদ, নাম ভূতেশ্বর বাগ। সার্থকনামা ব্যক্তি, কারণ তাঁহার গায়ের রঙ ভূতের মতন এবং মুখখানা বাঘের মতন ; উপরন্তু দেহায়তন হাতির মতন। মাথায় একগাছিও চুল নাই, বয়স ষাটের কাছাকাছি। ইনি বোধহয় যৌবনকালে গুণ্ডা ছিলেন অথবা কুস্তিগির ছিলেন, বয়োগতে ব্যায়াম সমিতি খুলিয়া বসিয়াছেন।

নন্দ বলিল, 'ভূতেশ্বরদা, ব্যোমকেশবাবু মস্ত ডিটেক্‌টিভ, সত্যকামকে চেনেন।'

ভূতেশ্বর ব্যোমকেশের দিকে বাঘা চোখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'আপনি পুলিসের লোক ? ঐ ছোঁড়ার মুরুব্বি ?'

ব্যোমকেশ সবিনয়ে জানাইল, সে পুলিসের লোক নয়, সত্যকামের সহিত তাহার আলাপও মাত্র একদিনের। সত্যকামকে প্রহার করিবার প্রয়োজন কেন হইয়াছে তাহাই শুধু জানিতে চায়, অন্য কোনও দুরভিসন্ধি নাই। ভূতেশ্বর একটু নরম হইয়া বলিলেন, 'ছোঁড়া পগেয়া পাজি। পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের কাছে নালিশ করেছেন। ছোঁড়া মেয়েদের বিরক্ত করে। এটা ভদ্দরলোকের পাড়া, এ-পাড়ায় ও-সব চলবে না।'

এই সময় আরও কয়েকজন গলদঘর্ম মল্লবীর ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমাদের ঘিরিয়া বসিয়া কটমট চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, সত্যকামকে ঠ্যাঙাইবার সঙ্কল্প একজনের নয়, সমস্ত ব্যায়াম সমিতির অনুমোদন ইহার পশ্চাতে আছে। নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। গতিক সুবিধার নয়, সত্যকামের ফাঁড়াটা আমাদের উপর দিয়া বুঝি যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু সামলাইয়া লইল। শান্তস্বরে বলিল, 'পাড়ার কোনও লোক যদি বজ্জাতি করে তাকে শাসন করা পাড়ার লোকেরই কাজ, এ-কাজ অন্য কাউকে দিয়ে হয় না। আপনারা সত্যকামকে শায়েস্তা করতে চান তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই। তাকে যতটুকু জানি দু' ঘা পিঠে পড়লে তার উপকারই হবে। শুধু একটা কথা, খুনোখুনি করবেন না। আর, কাজটা সাবধানে করবেন, যাতে ধরা না পড়েন।'

নন্দ এক মুখ হাসিয়া বলিল, 'সেইজন্যেই তো কাজটা আমি হাতে নিয়েছি স্যার। দু'-চার ঘা দিয়ে কেটে পড়ব। আমি এ-পাড়ার ছেলে নই, চিনতে পারলেও সনাক্ত করতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া গাত্রোত্থান করিল, 'তবু, যদি কোনও গণ্ডগোল বাধে আমাকে খবর দিও। আজ তাহলে উঠি। নমস্কার, ভূতেশ্বরবাবু।'

বড় রাস্তায় আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া নন্দ আখড়ায় ফিরিয়া গেল। ব্যোমকেশ নিশ্বাস

ছাড়িয়া বলিল, 'বাপ, একেবারে বাঘের গুহায় গলা বাড়িয়েছিলাম !'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু সত্যকামকে মারধর করার উৎসাহ দেওয়া কি তোমার উচিত ? তুমি ওর টাকা নিয়েছ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দু'-চার ঘা খেয়ে যদি ওর প্রাণটা বেঁচে যায় সেটা কি ভাল নয় ?'

তিন

যদিও আমি কোনও দিন অফিস-কাছারি করি নাই, তবু কেন জানি না রবিবার সকালে ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হয়। পূর্বপুরুষেরা চাকুরে ছিলেন, রক্তের মধ্যে বোধ হয় দাসত্বের দাগ রহিয়া গিয়াছে।

পরদিনটা রবিবার ছিল, বেলা সাড়ে সাতটার সময় চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখি ব্যোমকেশ দু'হাতে খবরের কাগজটা খুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। আমার আগমনে সে চক্ষু ফিরাইল না, সংবাদপত্রটাকেই যেন সম্বোধন করিয়া বলিল, 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত !'

তাহার ভাবগতিক ভাল ঠেকিল না, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী হয়েছে ?'

সে কাগজ নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'সত্যকাম কাল রাত্রে মারা গেছে।'

'অ্যাঁ ! কিসে মারা গেল ?'

'তা জানি না। —তৈরি হয়ে নাও, আধ ঘন্টার মধ্যে বেরুতে হবে।'

আমি কাগজখানা তুলিয়া লইলাম। মধ্য পৃষ্ঠার তলার দিকে পাঁচ লাইনের খবর—

—অদ্য শেষ রাত্রে ধর্মতলার প্রসিদ্ধ সুচিত্রা এম্পোরিয়মের মালিক সত্যকাম দাসের সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। পুলিস তদন্তের ভার লইয়াছে।

সত্যকাম তবে ঠিকই বুঝিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্বাভাস পাইয়াছিল। কিন্তু এত শীঘ্র। প্রথমেই স্মরণ হইল, কাল সন্ধ্যার সময় নন্দ ঘোষ চাদরের মধ্যে খেঁটে লুকাইয়া বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করিতেছিল—

বেলা সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশ ও আমি আমহার্স্ট স্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম। ফটকের বাহিরে ফুটপাথের উপর একজন কনস্টেবল দাঁড়াইয়া আছে ; একটু খুঁতখুঁত করিয়া আমাদের ভিতরে যাইবার অনুমতি দিল।

ইট-বাঁধানো রাস্তা দিয়া সদরে উপস্থিত হইলাম। সদর দরজা খোলা রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে কেহ নাই। বাড়ির ভিতর হইতে কান্নাকাটির আওয়াজও পাওয়া যাইতেছে না। ব্যোমকেশ দরজার সম্মুখে পৌঁছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নীরবে মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। দেখিলাম দরজার ঠিক সামনে ইট-বাঁধানো রাস্তা যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে খানিকটা রক্তের দাগ। কাঁচা রক্ত নয়, বিঘতপ্রমাণ স্থানের রক্ত শুকাইয়া চাপড়া বাঁধিয়া গিয়াছে।

আমরা একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম ; ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল। তারপর আমরা রক্ত-লিপ্ত স্থানটাকে পাশ কাটাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

একটি চওড়া বারান্দা, তাহার দুই পাশে দুইটি দরজা। একটি দরজায় তালা লাগানো, অন্যটি খোলা ; খোলা দরজা দিয়া মাঝারি আয়তনের অফিস-ঘর দেখা যাইতেছে। ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল, টেবিলের সম্মুখে উষাপতিবাবু একাকী বসিয়া আছেন।

উষাপতিবাবু টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে চিবুক আবদ্ধ করিয়া

বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে দুঃস্বপ্নভরা চোখ তুলিয়া চাহিলেন, শুষ্ক নিষ্প্রাণ স্বরে বলিলেন, 'কী চাই ?'

ব্যোমকেশ টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, 'এ-সময় আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম, মাফ করবেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী—'

উষাপতিবাবু ঈষৎ সজাগ হইয়া পর্যায়ক্রমে আমাদের দিকে চোখ ফিরাইলেন, তারপর বলিলেন, 'আপনাদের আগে কোথায় দেখেছি। বোধহয় সুচিত্রায়।—কী নাম বললেন ?'

'ব্যোমকেশ বক্সী। ইনি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।—কাল আমরা আপনার দোকানে গিয়েছিলাম—'

উষাপতিবাবু আমাদের নাম পূর্বে শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু খদ্দেরের প্রতি দোকানদারের স্বাভাবিক শিষ্টতা বোধ হয় তাঁহার অস্থিমজ্জাগত, তাই কোনও প্রকার অধীরতা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, 'কিছু দরকার আছে কি ? আমি আজ একটু—বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'জানি। সেই জন্যেই এসেছি। সত্যকামবাবু—'

'আপনি সত্যকামকে চিনতেন ?'

'মাত্র পরশু দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন—'

'কী প্রস্তাব ?'

'তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, হঠাৎ যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে আমি তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করব।'

উষাপতিবাবু এবার খাড়া হইয়া বসিলেন, কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া যেন প্রবল হৃদয়াবেগ দমন করিয়া লইলেন, তারপর সংযত স্বরে বলিলেন, 'আপনারা বসুন।—সত্যকাম তাহলে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মাফ করবেন, আপনার কাছে সত্যকাম কেন গিয়েছিল বুঝতে পারছি না। আপনি—আপনার পরিচয়—মানে আপনি কি পুলিসের লোক ? কিন্তু পুলিস তো কাল রাত্রেই এসেছিল, তারা—'

'না, আমি পুলিসের লোক নই। আমি সত্যান্বেষী। বেসরকারী ডিটেক্‌টিভ বলতে পারেন।'

'ও—' উষাপতিবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁরপর বলিলেন, 'সত্যকাম কাকে সন্দেহ করে, আপনাকে বলেছিল কি ?'

'না, কারুর নাম করেননি।—এখন আপনি যদি অনুমতি করেন আমি অনুসন্ধান করতে পারি।'

'কিন্তু—পুলিস তো অনুসন্ধানের ভার নিয়েছে, তার চেয়ে বেশি আপনি কী করতে পারবেন ?'

'কিছু করতে পারব কিনা তা এখনও জানি না তবে চেষ্টা করতে পারি।'

এত বড় শোকের মধ্যেও উষাপতিবাবু যে বিষয়বুদ্ধি হারান নাই তাই তাহার পরিচয় এবার পাইলাম।

তিনি বলিলেন, 'আপনি প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ, আপনাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছুই দিতে হবে না। আমার পারিশ্রমিক সত্যকামবাবু দিয়ে গেছেন।'

উষাপতিবাবু প্রখর চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর চোখ নামাইয়া বলিলেন,

'ও। তা আপনি অনুসন্ধান করতে চান করুন। কিন্তু কোনও লাভ নেই, ব্যোমকেশবাবু।'

'লাভ নেই কেন?'

'সত্যকাম তো আর ফিরে আসবে না, শুধু জল ঘোলা করে লাভ কী?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে উষাপতিবাবুর পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরস্বরে বলিল, 'আপনার মনের ভাব আমি বুঝেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জল ঘোলা হতে আমি দেব না। আমার উদ্দেশ্য শুধু সত্য আবিষ্কার করা।'

উষাপতিবাবু একটি ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিলেন, 'বেশ। আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল কখন কীভাবে সত্যকামবাবুর মৃত্যু হয়েছিল আমি কিছুই জানি না। আপনি বলতে পারবেন কি?'

উষাপতিবাবুর মুখখানা যেন আরও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, তিনি বুকের উপর একবার হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'আমিই বলি—আর কে বলবে? কাল রাত্রি একটার সময় আমি নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দুম্ করে একটা আওয়াজ। মনে হল যেন সদরের দিক থেকে এল—'

'মাফ করবেন, আপনার শোবার ঘর কোথায়?'

উষাপতিবাবু ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এর ওপরের ঘর। আমি একাই শুই, পাশের ঘরে স্ত্রী শোন।'

'আর সত্যকামবাবু কোন্ ঘরে শুতেন?'

'সত্যকাম নীচে শুত। ঐ যে বারান্দার ওপারে ঘরের দোরে তালা লাগানো রয়েছে ওটা তার শোবার ঘর ছিল। আমার স্ত্রীর শোবার ঘর ওর ওপরে।'

'সত্যকামবাবু নীচে শুতেন কেন?'

উষাপতিবাবু উত্তর দিলেন না, উদাসচক্ষে বাহিরের জানালার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, রাত্রিকালে নির্বিঘ্নে বহির্গমন ও প্রত্যাবর্তনের সুবিধার জন্যই সত্যকাম নীচের ঘরে শয়ন করিত। তাহার রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময়েরও ঠিক ছিল না।

এই সময় ভিতর দিকের দরজার পর্দা সরাইয়া একটি মেয়ে হাতে সরবতের গেলাস লইয়া প্রবেশ করিল এবং আমাদের দেখিয়া থমকিয়া গেল, অনিশ্চিত স্বরে একবার 'মামা—' বলিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল। মেয়েটির বয়স সতেরো-আঠারো, সুন্দরী নয় কিন্তু পুরন্ত গড়ন, চটক আছে। বর্তমানে তাহার মুখে-চোখে শঙ্কার কালো ছায়া পড়িয়াছে।

উষাপতিবাবু তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'দরকার নেই।' মেয়েটি চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার বাড়িতে কে কে থাকে?'

উষাপতিবাবু বলিলেন, 'আমরা ছাড়া আমার দুই ভাগনে ভাগনী থাকে।'

'এটি আপনার ভাগনী?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন এরা আপনার কাছে আছে?'

'বছরখানেক আগে ওদের বাপ মারা যায়। মা আগেই গিয়েছিল। সেই থেকে আমি ওদের প্রতিপালন করছি। বাড়িতে আমরা ক'জন ছাড়া আর কেউ নেই।'

'চাকর-বাকর?'

'পুরনো চাকর সহদেব বাড়িতেই থাকে। সে ছাড়া ঝি আর বামনী আছে, তারা রাত্রে থাকে না।'

'বুঝেছি। তারপর কাল রাত্রির ঘটনা বলুন।'

উষাপতিবাবু চোখের উপর দিয়া একবার করতল চালাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। আওয়াজ শুনে আমি ব্যালকনির দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে অন্ধকার, কিছু দেখতে পেলাম না। তারপরই সদর দরজার কাছ থেকে সহদেব চীৎকার করে উঠল...ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে এলাম, দেখি সহদেব দরজা খুলেছে, আর—সত্যকাম দরজার সামনে পড়ে আছে। প্রাণ নেই, পিঠের দিক থেকে গুলি ঢুকেছে।'

'গুলি! বন্দুকের গুলি?'

'হ্যাঁ। সত্যকাম রোজই দেরি করে বাড়ি ফিরত। সহদেব বারান্দায় শুয়ে থাকত, দরজায় টোকা পড়লে উঠে দোর খুলে দিত। কাল সে টোকা শুনে দোর খোলবার আগেই কেউ পিছন দিক থেকে সত্যকামকে গুলি করেছে।'

'গুলি। আমি ভেবেছিলাম—' ব্যোমকেশ থামিয়া বলিল, 'তারপর বলুন।'

উষাপতিবাবু একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিলেন, 'তারপর আর কী? পুলিসে টেলিফোন করলাম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নতমুখে চিন্তা করিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, 'সত্যকামবাবুর ঘরে তালা কে লাগিয়েছে?'

উষাপতি বলিলেন, 'সত্যকাম যখনই বাড়ি বেরুত, নিজের ঘরে তালা দিয়ে যেত। কালও বোধহয় তালা দিয়েই বেরিয়েছিল, তারপর—'

'বুঝেছি। ঘরের চাবি তাহলে পুলিসের কাছে?'

'খুব সম্ভব।'

'পুলিস ঘর খুলে দেখেনি?'

'না।'

'যাক, আপনার কাছে আর বিশেষ কিছু জানবার নেই। এবার বাড়ির অন্য সকলকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

'কাকে ডাকব বলুন।'

'সহদেব বাড়িতে আছে?'

'আছে নিশ্চয়। ডাকছি।'

উষাপতিবাবু উঠিয়া গিয়া অন্দরের দ্বারের নিকট হইতে সহদেবকে ডাকিলেন, তারপর আবার আসিয়া বসিলেন।

সহদেব প্রবেশ করিল। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, শরীরে কেবল হাড় ক'খানা আছে। মাথায় ঝাঁকড়া পাকা চুল, ভ্রূ পাকা, এমন কি চোখের মণি পর্যন্ত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। লোলচর্ম শিথিলপেশী মুখে হাবলার মত ভাব।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নাম সহদেব? তুমি কত বছর এ-বাড়িতে কাজ করছ?'

সহদেব উত্তর দিল না, ফ্যালফ্যাল করিয়া একবার আমাদের দিকে একবার উষাপতিবাবুর দিকে তাকাইতে লাগিল। উষাপতিবাবু বলিলেন, 'ও আমার শ্বশুরের সময় থেকে এ-বাড়িতে আছে—প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর।'

ব্যোমকেশ সহদেবকে বলিল, 'তুমি কাল রাত্রে—'

ব্যোমকেশ কথা শেষ করিবার আগেই সহদেব হাত জোড় করিয়া বলিল, 'আমি কিছু জানিনে বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার কথাটা শুনে উত্তর দাও। কাল রাত্রে সত্যকামবাবু যখন দোরে টোকা দিয়েছিলেন তখন তুমি জেগে ছিলে ?'

সহদেব পূর্ববৎ জোড়হস্তে বলিল, 'আমি কিছু জানিনে বাবু।'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'মনে করবার চেষ্টা কর। সে-সময় দুম্ করে একটা আওয়াজ শুনেছিলে ?'

'আমি কিছু জানিনে বাবু।'

অতঃপর ব্যোমকেশ যত প্রশ্ন করিল সহদেব তাহার একটিমাত্র উত্তর দিল—আমি কিছু জানিনে বাবু। এই সর্বাঙ্গীন অজ্ঞতা কতখানি সত্য অনুমান করা কঠিন ; মোট কথা সহদেব কিছু জানিলেও বলিবে না। ব্যোমকেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তুমি যেতে পার। উষাপতিবাবু, এবার আপনার ভাগনীকে ডেকে পাঠান।'

উষাপতিবাবু সহদেবকে বলিলেন, 'চুমকিকে ডেকে দে।'

সহদেব চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চুমকি প্রবেশ করিল, চেষ্টাকৃত দৃঢ়তার সহিত টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম তাহার মুখে আশঙ্কার ছায়া আরও গাঢ় হইয়াছে, আমাদের দিকে চোখ তুলিয়াই আবার নত করিল।

ব্যোমকেশ সহজ সুরে বলিল, 'তোমার মামার কাছে শুনলাম তুমি বছরখানেক হল এ-বাড়িতে এসেছ। আগে কোথায় থাকতে ?'

চুমকি ধরা-ধরা গলায় বলিল, 'মানিকতলায়।'

'লেখাপড়া কর ?'

'কলেজে পড়ি।'

'আর তোমার ভাই ?'

'দাদাও কলেজে পড়ে।'

'আচ্ছা, কাল রাত্তিরে তুমি কখন জানতে পারলে ?'

চুমকি একটু দম লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'আমি ঘুমোচ্ছিলুম। দাদা এসে দোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল, তখন ঘুম ভাঙল।'

'ও—তুমি রাত্তিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোও ?'

চুমকি যেন থতমত খাইয়া গেল, বলিল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার শোবার ঘর নীচে না ওপরে ?'

'নীচে পিছন দিকে। আমার ঘরের পাশে দাদার ঘর।'

'তাহলে বন্দুকের আওয়াজ তুমি শুনতে পাওনি ?'

'না।'

'ঘুম ভাঙার পর তুমি কী করলে ?'

'দাদা আর আমি এই ঘরে এলুম। মামা পুলিসকে ফোন করেছিলেন।'

'আর তোমার মামীমা ?'

'তাঁকে তখন দেখিনি। এখান থেকে ওপরে গিয়ে দেখলুম তিনি নিজের ঘরের মেঝেয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।' চুমকির চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সদয় কণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যাও। তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দিও।'

চুমকি ঘরের বাহিরে যাইতে না যাইতে তাহার দাদা ঘরে প্রবেশ করিল ; মনে হইল সে দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিয়া ছিল। ভাই বোনের চেহারায় খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ছেলেটির চোখের দৃষ্টি একটু অদ্ভুত ধরনের। প্যাঁচার চোখের মত তাহার চোখেও একটা

নির্নিমেষ অচঞ্চল একাগ্রতা। সে অত্যন্ত সংযতভাবে টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিষ্পলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

সওয়াল জবাব আরম্ভ হইল।

'তোমার নাম কী?'

'শীতাংশু দত্ত।'

'বয়স কত?'

'কুড়ি।'

'কাল রাত্রে তুমি জেগে ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী করছিলে?'

'পড়ছিলাম।'

'কী পড়ছিলে? পরীক্ষার পড়া?'

'না। গোর্কির 'লোয়র ডেপ্‌থস' পড়ছিলাম। রাত্রে পড়া আমার অভ্যাস।'

'ও...বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলে?'

'পেয়েছিলাম। কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ বলে বুঝতে পারিনি।'

'তারপর?'

'সহদেবের চীৎকার শুনে গিয়ে দেখলাম।'

'তারপর ফিরে এসে তোমার বোনকে জাগালে?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চিবুকের তলায় করতল রাখিয়া বসিয়া রহিল। দেখিলাম উষাপতিবাবুও নির্লিপ্তভাবে বসিয়া আছেন, প্রশ্নোত্তরের সব কথা তাঁহার কানে যাইতেছে কিনা সন্দেহ। মনের অন্ধকার অতলে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন।

ব্যোমকেশ আবার সওয়াল আরম্ভ করিল।

'তুমি রাত্রে শোবার সময় দরজা বন্ধ করে শোও?'

'না, খোলা থাকে।'

'চুমকির দোর বন্ধ থাকে?'

'হ্যা। ও মেয়ে, তাই।'

'যাক।—কাল রাত্রে সকলে শুয়ে পড়বার পর তুমি বাড়ির বাইরে গিয়েছিলে?'

'না।'

'সদর দরজা ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুবার অন্য কোনও রাস্তা আছে?'

'আছে। খিড়কির দরজা।'

'কাল রাত্রে খিড়কির দরজা দিয়ে কেউ বেরিয়েছিল?'

'না। বেরুলে আমি জানতে পারতাম। খিড়কির দরজা আমার ঘরের পাশেই। দোর খুললে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হয়। তাছাড়া রাত্রে খিড়কির দরজায় তালা লাগানো থাকে।'

'তাই নাকি। তার চাবি কার কাছে থাকে?'

'সহদেবের কাছে।'

'হুঁ। সত্যকামবাবু রাত্রে দেরি করে বাড়ি ফিরতেন তুমি জান?'

'জানি।'

'রোজ জানতে পারতে কখন তিনি বাড়ি ফেরেন?'

'রোজ নয়, মাঝে মাঝে পারতাম।'

'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

শীতাংশু আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ উষাপতিবাবুর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, 'উষাপতিবাবু, এবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি?'

উষাপতিবাবু চমকিয়া উঠিলেন, 'আমার স্ত্রী! কিন্তু তিনি—তাঁর অবস্থা—'

'তাঁর অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তাঁকে এখানে আসতে হবে না, আমিই তাঁর ঘরে গিয়ে দু'-একটা কথা—'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইল না, একটা মহিলা অধীর হস্তে পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে উষাপতিবাবুর স্ত্রী, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ব্যোমকেশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি তীব্র স্বরে বলিলেন, 'কেন আপনি আমার স্বামীকে এমনভাবে বিরক্ত করছেন? কী চান আপনি? কেন এখানে এসেছেন?'

আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মহিলাটির বয়স বোধকরি চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও কম বয়স মনে হয়। রঙ ফরসা, মুখে সৌন্দর্যের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। বর্তমানে তাঁহার মুখে পুত্রশোক অপেক্ষা ক্রোধই অধিক ফুটিয়াছে। ব্যোমকেশ অত্যন্ত মোলায়েম সুরে বলিল, 'আমাকে মাফ করবেন, নেহাত কর্তব্যের দায়ে আপনাদের বিরক্ত করতে এসেছি—'

মহিলাটি বলিলেন, 'কে ডেকেছে আপনাকে? এখানে আপনার কোনও কর্তব্য নেই। যান আপনি, আমাদের বিরক্ত করবেন না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি কি চান না যে সত্যকামবাবুর মৃত্যুর একটা কিনারা হয়?'

'না, চাই না। যা হবার হয়েছে। আপনি যান, আমাদের রেহাই দিন।'

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

আমরা উষাপতিবাবুর পানে চাহিলাম। তিনি বিস্ময়াহতভাবে স্ত্রীর পানে চাহিয়া আছেন, যেন নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। মহিলাটিও একবার স্বামীর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

চার

আমরা সদর দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উষাপতিবাবুও আমাদের পিছন পিছন আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখের বিস্ময়াহত ভাব সম্পূর্ণ কাটে নাই। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, 'আমাদের মানসিক অবস্থা বুঝে ক্ষমা করবেন। নমস্কার।'

দরজা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কী?'

আসিবার সময় চোখে পড়ে নাই, কবাটের বাহিরের দিকে নীচের চৌকাঠ হইতে হাতখানেক উঁচুতে একটি সোনালী চাকতি চক্‌চক্‌ করিতেছে। উষাপতিবাবু দ্বার বন্ধ করিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। চাকতিটা আয়তনে চাঁদির টাকার চেয়ে কিছু বড়। ব্যোমকেশ নত হইয়া সেটা দেখিল, আঙুল দিয়া সেটা পরীক্ষা করিল। বলিল, 'রাংতার চাকতি, গঁদ দিয়ে কবাটে জোড়া রয়েছে।' সে সোজা হইয়া উষাপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা কী?'

উষাপতিবাবু দ্বিধাভরে বলিলেন, 'কী জানি, আগে লক্ষ্য করেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সম্প্রতি কেউ সেঁটেছে। বাড়িতে ছোট ছেলেপিলে থাকলে বোঝা যেত। কিন্তু—আপনি একবার খোঁজ নেবেন?'

উষাপতিবাবু সহদেবকে ডাকিলেন, সে যথারীতি বলিল, 'আমি কিছু জানিনে বাবু।' চুমকিও কিছু বলিতে পারিল না। শীতাংশু বলিল, 'আমি কাল সন্ধ্যের সময় যখন বাড়ি এসেছি তখন ওটা ছিল না।'

আমার মাথায় নানা চিন্তা আসিতে লাগিল। সত্যকামকে যে খুন করিয়াছে সে কি নিজের পরিচয়ের ইঙ্গিত এইভাবে রাখিয়া গিয়াছে? হরতনের টেক্কা! লোমহর্ষণ উপন্যাসে এই ধরনের জিনিস দেখা যায় বটে। কিন্তু—

কোনও হদিস পাওয়া গেল না। আমরা চলিয়া আসিলাম।

রাস্তায় বাহির হইয়া ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'এখনও দশটা বাজেনি। চল, থানাটা ঘুরে যাওয়া যাক।'

থানার দিকে চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ির লোকের এজেহার শুনলে। কী মনে হল?'

এই কথাটাই আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিল। বলিলাম, 'কাউকেই খুব বেশি শোকার্ত মনে হল না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রবাদ আছে, অল্প শোকে কাতর, বেশি শোকে পাথর।'

বলিলাম, 'প্রবাদ থাকতে পারে, কিন্তু উষাপতিবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর আচরণ খুব স্বাভাবিক নয়। সত্যকাম ভাল ছেলে ছিল না, নিজের উচ্ছৃঙ্খলতায় বাপমা'কে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সবই সত্যি হতে পারে। তবু ছেলে তো। একমাত্র ছেলে। আমার বিশ্বাস এই পরিবারের মধ্যে কোথাও একটা মস্ত গলদ আছে।'

'অবশ্য। সত্যকামই তো একটা মস্ত গলদ। সে যাক, দরজায় রাংতার চাকতির অর্থ কিছু বুঝলে?'

'না। তুমি বুঝেছ?'

'সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে। কিন্তু তা যদি না হয়—'

থানায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, দারোগা ভবানীবাবু আমাদের পরিচিত লোক। বয়স্থ ব্যক্তি; ক্রশ-বেল্ট টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিয়া কাজ করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া খুব খুশি হইয়াছেন মনে হইল না। তবু যথোচিত শিষ্টতা দেখাইয়া শেষে খাটো গলায় বলিলেন, 'আপনি আবার এর মধ্যে কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়েছি।'

ভবানীবাবু পূর্ববৎ নিম্নস্বরে বলিলেন, 'ছোঁড়া পাকা শয়তান ছিল। যে তাকে খুন করেছে সে সংসারের উপকার করেছে। এমন লোককে মেডেল দেওয়া উচিত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। আপনারা যা করছেন করুন, আমি তার মধ্যে নাক গলাতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই—'

ভবানীবাবু তাহাকে দৃষ্টি-শলাকায় বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'সত্যান্বেষণ? কী জানতে চান বলুন।'

'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এখনও বোধহয় আসেনি?'

'না। সন্ধ্যে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে।'

'সন্ধ্যের পর আমি আপনাকে ফোন করব—বন্দুকের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে?'

'বড় বন্দুক নয়, পিস্তল কিম্বা রিভলবার। গুলিটা পিঠের বাঁ দিকে ঢুকেছে, সামনে কিন্তু

বেরোয়নি। শরীরের ভিতরেই আছে। পিঠে যে ফুটো হয়েছে সেটা খুব ছোট, তাই মনে হয় পিস্তল কিম্বা রিভলবার।'

'পিঠের দিকে ফুটো হয়েছে, তার মানে যে গুলি করেছে সে সত্যকামের পিছনে ছিল।'

'হ্যাঁ। হয়তো ফটকের ভিতর দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিল, যেই সত্যকাম সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অমনি গুলি করেছে, তারপর ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'হুঁ। এ-পাড়ায় একটা ব্যায়াম সমিতি আছে আপনি জানেন ?'

'জানি। তাদের কাজ নয়। তারা দু'-চার ঘা প্রহার দিতে পারে, খুন করবে না সবাই ভদ্রলোকের ছেলে।'

ভদ্রলোকের ছেলে খুন করে না, পুলিসের মুখে একথা নূতন বটে। কিন্তু ব্যোমকেশ সেদিক দিয়া গেল না, বলিল 'ভদ্রলোকের ছেলের কথায় মনে পড়ল। সত্যকামের এক পিসতুতো ভাই বাড়িতে থাকে, তাকে দেখেছেন ?'

ভবানীবাবু একটু হাসিলেন, 'দেখেছি। পুলিসে তার নাম আছে।'

'তাই নাকি! কী করেছে সে ?'

'ছেলেটা ভালই ছিল, তারপর গত দাঙ্গার সময় ওর বাপকে মুসলমানেরা খুন করে। সেই থেকে ওর স্বভাব বদলে গেছে। আমাদের সন্দেহ ও কম-সে-কম গোটা তিনেক খুন করেছে। অবশ্য পাকা প্রমাণ কিছু নেই।'

'ওর চোখের চাউনি দেখে আমারও সেই রকম সন্দেহ হয়েছিল। আপনার কি মনে হয় এ-ব্যাপারে তার হাত আছে ?'

'কিছুই বলা যায় না, ব্যোমকেশবাবু। সত্যকামের মত পাঁঠা যেখানে আছে সেখানে সবই সম্ভব। তবে যতদূর জানতে পারলাম যখন খুন হয় তখন সে বাড়ির মধ্যে ছিল। সহদেবের চীৎকার শুনে ওর মামা আর ও একসঙ্গে সদর দরজায় পৌঁচেছিল। সত্যকামকে পিছন থেকে যে গুলি করেছে তার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'ছাতের ওপর থেকে গুলি করা কি সম্ভব ?'

ভবানীবাবু বলিলেন, 'ছাতের ওপর গুলি করলে গুলিটা শরীরের ওপর দিক থেকে নীচের দিকে যেত। গুলিটা গেছে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে। সুতরাং—'

এই সময় টেলিফোন বাজিল। ভবানীবাবু টেলিফোনের মধ্যে দু'চার কথা বলিয়া আমাদের কহিলেন, 'আমাকে এখনি বেরুতে হবে। জোর তলব—'

'আমরাও উঠি।' ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ভাল কথা, মৃত্যুকালে সত্যকামের সঙ্গে কী কী জিনিস ছিল—'

'ঐ যে পাশের ঘরে রয়েছে, দেখুন না গিয়ে।' বলিয়া ভবানীবাবু কোমরে বেল্ট বাঁধিতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে একটি টেবিলের উপর কয়েকটি জিনিস রাখা রহিয়াছে। সোনার সিগারেট-কেসটি দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। তাছাড়া হুইস্কির ফ্লাস্ক, চামড়ার মনিব্যাগ, একটি ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ প্রভৃতি রহিয়াছে। ব্যোমকেশ সেগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া ফিরিয়া আসিল। ভবানীবাবু এতক্ষণে বেল্ট বাঁধা শেষ করিয়াছেন, দেরাজ হইতে পিস্তল লইয়া কোমরের খাপে পুরিতেছেন। বলিলেন, 'দেখলেন ? আর কিছু দেখবার নেই তো ? আচ্ছা, চলি।'

ভবানীবাবু চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, তিনি আসামীকে

ধরিবার কোনও চেষ্টাই করিবেন না। শেষ পর্যন্ত সত্যকামের মৃত্যু-রহস্য অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে।

আমরাও বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'এতদূর যখন এসেছি, চল বাগের আখড়া দেখে যাই।'

'এখন কি কারুর দেখা পাবে ?'

'দেখাই যাক না। আর কেউ না থাক বাগ মশাই নিশ্চয় গুহায় আছেন।'

বাঘ কিন্তু গুহায় নাই। গিয়া দেখিলাম দরজায় তালা লাগানো। একজন ভৃত্য শ্রেণীর লোক দাওয়ায় বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল, সে বলিল, 'ভুতু সর্দারকে খুঁজতেছেন ? আজ্ঞে তিনি আজ সকালের গাড়িতে কাশী গেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বল কি! এক্কেবারে কাশী!—তুমি কে ?'

লোকটি বলিল, 'আজ্ঞে আমি তেনার চাকর। ঘর ঝাঁট দি, কাপড় কাচি, কলসীতে জল ভরি। আজ সকালে ঘর ঝাঁট দিতে এসে দেখনু সর্দার খবরের কাগজ পড়তেছেন। কলসীতে জল ভরে নিয়ে এনু, সর্দার সেজেগুজে তৈরি। কইলেন, আমি কাশী চনু, সন্ধ্যেবেলা ছেলেরা এলে কয়ে দিও।'

বুঝিতে বাকী রহিল না, ভূতেশ্বর বাগ খবরের কাগজের সংবাদ পড়িয়াছেন এবং বিলম্ব না করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

বাসায় ফিরিলাম প্রায় সওয়া এগারোটায়। দেখি বন্ধ দরজার সামনে নন্দ ঘোষ প্রতীক্ষমাণভাবে পায়চারি করিতেছে। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখে শঙ্কিত অস্বাচ্ছন্দ্য। ব্যোমকেশ দ্বারের কড়া নাড়িয়া স্মিতমুখে নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী খবর ?'

'আজ্ঞে স্যার...' বলিয়া নন্দ ঠোঁট চাটিতে লাগিল।

পুঁটিরাম আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, আমরা নন্দকে লইয়া ভিতরে আসিয়া বসিলাম। নন্দ আরও দু'চার বার ঠোঁট চাটিয়া বলিল, 'সত্যকামের খবর শুনেছেন ?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'শুনেছি। তুমি কোথায় শুনলে ?'

নন্দ বলিল, 'সকালবেলায় ও-পাড়ায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, খবর পেলাম কাল রাত্তিরে কেউ সত্যকামকে গুলি করে মেরেছে। আমি কিন্তু কিচ্ছু জানি না স্যার। কাল সন্ধ্যেবেলা সেই যে আপনারা আখড়া থেকে চলে এলেন, তারপর আমি আরও ওদিকে যাইনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বোস, তোমাকে দু'-চারটে কথা জিজ্ঞেস করি। ও-পাড়ায় তোমার জানাশোনার মধ্যে কারুর পিস্তল কিম্বা রিভলবার আছে ?'

'না স্যার। থাকলেও আমি জানি না।'

'তোমাদের আখড়ায় কারুর নেই ?'

'জানি না। তবে একটা লোক ভূতেশ্বরের কাছে চোরাই পিস্তল বিক্রি করতে এসেছিল।'

'চোরাই পিস্তল!'

'হ্যাঁ স্যার। শুনেছি যুদ্ধের পর অনেক চোরাই পিস্তল কিনতে পাওয়া যেত।'

'ভূতেশ্বর কিনেছিল ?'

'তা জানি না। আমাদের সামনে কেনেনি।'

'আচ্ছা, ও-কথা যাক।—সত্যকাম ভদ্রঘরের মেয়েদের পিছনে লাগত। কীভাবে পিছনে লাগত বলতে পার ?'

নন্দ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'স্যার, সত্যকাম জাদুমন্ত্র জানত, দুটো

কথা বলেই মেয়েগুলোকে বশ করে ফেলত। তারপর নিজের দোকানে নিয়ে যেত, ভাল ভাল জিনিস উপহার দিত, হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত—' কুণ্ঠিতভাবে সে চুপ করিল।

'বুঝেছি। মেয়েরাও নেহাত নির্দোষ নয়।' গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ সিগারেট টানিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'স্ত্রী-স্বাধীনতাও বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। যাক, কোন্ কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে সত্যকামের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তুমি বলতে পার?'

নন্দ আরও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, 'সকলের কথা জানি না স্যার, তবে ৭৩ নম্বরের অখিলবাবু আমাদের ব্যায়াম সমিতিতে নালিশ করেছিলেন, তাঁর মেয়ে শোভনা—। তারপর রামেশ্বরবাবুর নাতনী—সেও কিছু দিন সত্যকামের ফাঁদে পড়েছিল, ভীষণ কেলেঙ্কারি হবার যোগাড় হয়েছিল। যাহোক, তার বিয়ে হয়ে গেছে—'

'আর কেউ?'

'আর—ভবানীবাবুর মেয়ে সলিলা—'

'কোন ভবানীবাবু?'

'ও-পাড়ার থানার দারোগা ভবানীবাবু। তিনি মেয়েকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। তারপর এখন মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

ব্যোমকেশের সহিত আমার একবার চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়মোড়া ভাঙিল, নন্দকে বলিল, 'আচ্ছা নন্দ, তুমি আজ এস। অন্য সময় তোমার সঙ্গে আবার কথা হবে। ভাল কথা, তোমাদের ওস্তাদ পালিয়েছে। তুমি এখন কিছুদিন আর ওদিকে যেও না।'

নন্দ আবার ঠোঁট চাটিয়া বলিল, 'আচ্ছা স্যার।'

পাঁচ

সমস্ত দিন ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। বৈকালে সত্যবতী দু'-একবার কাশ্মীর যাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্যোমকেশ শুনিতে পাইল না, ইজি-চেয়ারে শুইয়া কড়িকাঠের পানে তাকাইয়া রহিল।

আমি বলিলাম, 'তাড়া কিসের? এ-ব্যাপারের আগে নিষ্পত্তি হোক।'

সত্যবতী বলিল, 'নিষ্পত্তি হতে বেশি দেরি নেই। মুখ দেখে বুঝতে পারছ না!'

ব্যোমকেশ সত্যবতীর কথা শুনিতে পাইল কিনা বলা যায় না, আপন মনে 'রাংতার চাকতি' বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সত্যবতী আমার পানে অর্থপূর্ণ ঘাড় নাড়িয়া মুচকি হাসিল।

সন্ধ্যার পর থানায় ফোন করিবার কথা। আমি স্মরণ করাইয়া দিলে ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমিই ফোন কর অজিত।'

থানার নম্বর বাহির করিয়া ফোন করিলাম। ভবানীবাবু উপস্থিত ছিলেন, বলিলেন, 'এইমাত্র রিপোর্ট এসেছে, মৃত্যুর সময় রাত্রি বারটা থেকে দুটোর মধ্যে। গুলিটা ·৪৫ রিভলবারের, বাঁ দিকে স্ক্যাপিউলার নীচে দিয়ে ঢুকে হৃদ্‌যন্ত্র ভেদ করে ডান দিকের তৃতীয় পঞ্জরে আটকেছে। গুলির গতি নীচের দিক থেকে একটু ওপর দিকে, পাশের দিক থেকে মাঝের দিকে।—অন্য কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।—আর কি! পেটের মধ্যে খানিকটা মদ পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশকে বলিলাম। সে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, 'গুলির

গতি—কী বললে ?'

'নীচের দিক থেকে একটু, ওপর দিকে, পাশের দিক থেকে মাঝের দিকে। অর্থাৎ যে গুলি করেছে সে রাস্তার বাঁ দিকে ঝোপের মধ্যে বসে ছিল, বসে বসেই গুলি করেছে।'

ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, 'উবু হয়ে বসে গুলি করেছে ! কেন ?'

'তা জানি না। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে গুলি করেনি।'

ব্যোমকেশ আবার ইজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'ব্যাপারটা ভেবে দেখ। তোমাদের ধারণা আততায়ী আগে থেকে ফটকের ভিতর দিকে লুকিয়ে ছিল, সত্যকাম ফটক দিয়ে ঢুকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট রাস্তা পার হয়ে সদর দরজার সামনে এসে কড়া নাড়ল, তখন আততায়ী তাকে গুলি করল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—কেন ? সত্যকাম যেই ফটক দিয়ে ঢুকল আততায়ী তখনই তাকে গুলি করল না কেন। তাতেই তো তার সুবিধে, গুলি করেই চট্ করে ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ভয়ও থাকত না।'

'প্রশ্নের উত্তর কী—তুমিই বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত এই যে, আততায়ী ওদিক থেকে গুলি করেনি। কিন্তু তার চেয়েও ভাবনার কথা, রাংতার চাকতিটা কে লাগিয়েছিল, কখন লাগিয়েছিল, এবং কেন লাগিয়েছিল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওটা তাহলে আকস্মিক নয় ?'

'যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে ওটা আকস্মিক নয়, তার একটা গূঢ় অর্থ আছে। সেই অর্থ জানতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে।'

আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম রাংতার চাকতির তাৎপর্য কী ? যদি ধরা যায় আততায়ী ওটা লাগাইয়াছিল তবে তাহার উদ্দেশ্য কী ছিল ? যদি আততায়ী না লাগাইয়া থাকে তবে কে লাগাইল ? বাড়ির কেহ যদি না হয় তবে কে ? সত্যকাম কি ? কিন্তু কেন ?

ব্যোমকেশ হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, 'অজিত, সত্যকামের সঙ্গে কী কী জিনিস ছিল—থানায় টেবিলের ওপর দেখেছিলে—মনে আছে ?'

বলিলাম, 'সিগারেট-কেস ছিল, রিস্টওয়াচ ছিল, মনিব্যাগ ছিল, মদের ফ্লাস্ক ছিল আর—একটা ইলেকট্রিক টর্চ ছিল।'

ব্যোমকেশ আবার আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল, 'ইলেকট্রিক টর্চ—। কলকাতার পথ চলবার জন্যে ইলেকট্রিক টর্চ দরকার হয় না।"

'না। কিন্তু ফটক থেকে সদর দরজা পর্যন্ত যেতে হলে দরকার হয়।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, 'তাহলে সত্যকাম টর্চের আলোয় আততায়ীকে দেখতে পায়নি কেন ?'

সহসা এ-প্রশ্নের উত্তর যোগাইল না। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর ব্যোমকেশ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলিল, 'কাল সকালে শীতাংশুর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা দরকার।'

আমি উচ্চকিতভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, কিন্তু সে আর কিছু বলিল না ; বোধ করি কড়িকাঠ গুণিতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখের বিরস অন্যমনস্কতা আর নেই, যেন সে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখি ব্যোমকেশ কাহাকে ফোন করিতেছে। আমি চায়ের পেয়ালা লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলে সেও আসিয়া বসিল। তাহার মুখ গম্ভীর।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে ফোন করছিলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উষাপতিবাবুকে।'

'হঠাৎ উষাপতিবাবুকে?'

'শীতাংশুকে পাঠিয়ে দিতে বললাম।'

'ও।—ওদের বাড়ির খবর কী?'

'খবর—পুলিস কাল সন্ধ্যেবেলা লাশ ফেরত দিয়েছিল—ওঁরা শেষ রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরেছেন।' ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল যদি পুলিস খানাতল্লাসি করত তাহলে রিভলভারটা বোধ হয় বাড়িতেই পাওয়া যেত। এখন আর পাওয়া যাবে না।'

'তার মানে বাড়ির লোকের কাজ!'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

আধ ঘণ্টা পরে শীতাংশু আসিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'এস—বোস। কাল তোমার মামার সামনে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।'

শীতাংশু ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসিল এবং অপলক নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ আরম্ভ করিল, 'কাল থানায় খবর পেলুম তুমি নাকি দাঙ্গার সময় গোটা দুত্তিন খুন করেছ। কথাটা সত্যি?'

শীতাংশু উত্তর দিল না, কিন্তু ভয় পাইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না; নির্ভীক একাগ্র চোখে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পার, আমি পুলিসের লোক নই।'

শীতাংশুর গলাটা যেন ফুলিয়া উঠিল, সে চাপা গলায় বলিল, 'হ্যাঁ। ওরা আমার বাবাকে—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'জানি। কী দিয়ে খুন করেছিলে?'

'ছোরা দিয়ে।'

'তুমি কখনও রিভলভার ব্যবহার করেছ?'

'না।'

'সত্যকামের রিভলভার ছিল?'

'জানি না। বোধহয় ছিল না।'

'বাড়িতে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কিনা জান?'

'জানি না।'

'সত্যকামের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ছিল?'

'না। দু'জনে দু'জনকে এড়িয়ে চলতাম।'

'সত্যকাম লম্পট ছিল তুমি জানতে?'

'জানতাম।'

'তোমার বাবাকে তুমি ভালবাসতে। তোমার বোন চুমকিকেও নিশ্চয় ভালবাস?'

শীতাংশু উত্তর দিল না, কেবল চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'সত্যকামকে খুন করবার ইচ্ছে তোমার কোনদিন হয়েছিল?'

শীতাংশু এবারও উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার নীরবতার অর্থ স্পষ্টই বোঝা গেল। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল 'বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। সত্যকামকে তুমি বোধহয় শাসিয়ে দিয়েছিলে?'

শীতাংশু সহজভাবে বলিল, 'হ্যাঁ। তাকে বলে দিয়েছিলাম, বাড়িতে বেচাল দেখলেই খুন করব।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তীক্ষ্ণ চক্ষে নয়, যেন একটু অন্যমনস্কভাবে। তারপর বলিল, 'সে-রাত্রে সহদেবের চীৎকার শুনে তুমি সদরে গিয়ে কি দেখলে?'

'দেখলাম সত্যকাম দরজার বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।'

'কী করে দেখলে? সেখানে আলো ছিল?'

'সত্যকামের হাতে একটা জ্বলন্ত টর্চ ছিল, তারই আলোতে দেখলাম। তারপর মামা এসে সদরের আলো জ্বেলে দিলেন।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। দুই-তিনটা লম্বা টান দিয়া বলিল, 'ও-কথা যাক। সত্যকামকে নিয়ে তোমার মামা আর মামীর মধ্যে খুবই অশান্তি ছিল বোধহয়?'

'অশান্তি—?'

'হ্যাঁ। ঝগড়া বকাবকি—এ-রকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে।'

শীতাংশু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'না, ঝগড়া বকাবকি হত না।'

'একেবারেই না?'

'না। মামা আর মামীমার মধ্যে কথা নেই।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, 'কথা নেই! তার মানে?'

'মামা মামীমার সঙ্গে কথা বলেন না, মামীমাও মামার সঙ্গে কথা বলেন না।'

'সে কি, কবে থেকে?'

'আমি যবে থেকে দেখছি। আগে যখন মানিকতলায় ছিলাম, প্রায়ই মামার বাড়ি আসতাম। তখনও মামা-মামীমাকে কথা বলতে শুনিনি।'

'তোমার মামীমা কেমন মানুষ? ঝগড়াটে?'

'মোটেই না। খুব ভাল মানুষ।'

ব্যোমকেশ আর প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া যেন ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল। আমার মনে পড়িয়া গেল, কাল সকালবেলা উষাপতিবাবুর স্ত্রী সহসা ঘরে প্রবেশ করিলে তিনি বিস্ময়াহত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন। তখন তাঁহার সেই চাহনির অর্থ বুঝিতে পারি নাই।...স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ মনান্তর কি পুত্রের মৃত্যুতে জোড়া লাগিয়াছে?

শীতাংশু চলিয়া যাইবার পরও ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিল, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল, 'বড় ট্র্যাজিক ব্যাপার।—শীতাংশুকে কেমন মনে হল?'

'মনে হল সত্যি কথা বলছে।'

'ছেলেটা বুদ্ধিমান—ভারী বুদ্ধিমান।' বলিয়া সে আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টা পরে তাহার ধ্যান ভাঙিল বহির্দ্বারের কড়া নাড়ার শব্দে। আমি উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিলাম। দেখি—উষাপতিবাবু।

ছয়

ব্যোমকেশের আহ্বানে উষাপতিবাবু চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। ক্লান্ত অবসন্ন মূর্তি, চক্ষু দুটি ঈষৎ রক্তাভ; শরীর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

ব্যোমকেশ সিগারেটের কৌটা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিল। দুইজনে কিছুক্ষণ অনুসন্ধিৎসু

চক্ষে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তারপর উষাপতিবাবু বলিলেন, 'থাক, আমি এখনি উঠব। আপনার ফোন পাবার পর থানায় গিয়েছিলাম, তা ওরা তো কোনও খবরই রাখে না। তাই ভাবলাম দেখি যদি আপনি কোনও খবর পেয়ে থাকেন।'

উষাপতিবাবুর কথায় যে প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন ছিল ব্যোমকেশ সরাসরি তাহার উত্তর দিল না, বলিল, 'একদিনের কাজ নয়, সময় লাগবে। আপনার ওপর দিয়ে খুবই ধকল যাচ্ছে, আপনি আজ বাড়ি থেকে না বেরুলেই পারতেন। আপনার স্ত্রীকেও দেখা শোনা করা দরকার।'

উষাপতিবাবুর মুখ লক্ষ্য করিলাম, স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁহার মুখের কোনও ভাবান্তর হইল না; স্ত্রীর সহিত তাঁহার যে দীর্ঘকালের বিপ্রয়োগ তাহার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। বলিলেন, 'আমার স্ত্রীর জন্যেই ভাবনা। তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন।' একটু থামিয়া বলিলেন, 'ভাবছি কিছুদিনের জন্যে ওঁকে নিয়ে বাইরে ঘুরে এলে কেমন হয়। কলকাতার বাইরে গেলে হয়তো ওঁর মনটা—'

'তা ঠিক। কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?'

'না। কলকাতা ছেড়ে যেখানে হোক গেলেই বোধহয় কাজ হবে। কাশী বৃন্দাবন আগ্রা দিল্লী—। কিন্তু পুলিস আপত্তি করবে না তো?'

'পুলিসকে বলে যাবেন। আমার বোধ হয় আপত্তি করবে না।'

'যদি আপত্তি না করে, কাল পরশুর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। কলকাতা যেন বিষবৎ মনে হচ্ছে।—আচ্ছা নমস্কার।' বলিয়া উষাপতিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার দোকান কি বন্ধ রাখবেন?'

'দোকান—সুচিত্রা? না, বন্ধ রাখব কেন? দোকানের পুরনো খাজাঞ্চি ধনঞ্জয়বাবু আছেন। বিশ্বাসী লোক; তিনি চালাবেন। আমার ভাগনে শীতুকেও ভাবছি দোকানে ঢুকিয়ে নেব, পড়াশুনো করে আর কী হবে, দোকানটাই দেখুক। আর তো আমার কেউ নেই।' নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি দ্বারের পানে চলিলেন।

'আপনি কি এখন দোকানের দিকে যাচ্ছেন?'

'না, দোকানে এখন আর যাব না। ধনঞ্জয়বাবুকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি।'

'আসুন তাহলে—নমস্কার।'

উষাপতিবাবু প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ পর পর তিনটা সিগারেট নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আমি একবার বেরুচ্ছি। তুমি বাড়িতেই থাক।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'সুচিত্রা এম্পোরিয়মে। খাজাঞ্চি ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে আলাপ করা দরকার।'

ব্যোমকেশ যখন ফিরিল তখন দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি স্নান সারিয়া অপেক্ষা করিতেছি, সত্যবতী অস্থিরভাবে ভিতর-বাহির করিতেছে। ব্যোমকেশ পাঞ্জাবিটা খুলিয়া ফেলিল, পাখা চালাইয়া দিয়া তক্তপোশের উপর লম্বা হইল। বসন্তকাল হইলেও দুপুরবেলার রৌদ্র বেশ কড়া।

বলিলাম, 'খাজাঞ্চি মশায়ের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠেছিল দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। লোকটি কে জান? পরশু সুচিত্রার দোতলায় যে ক্যাশিয়ার আমাদের ক্যাশমেমো কেটেছিল সেই।'

'তাই নাকি? তা কী পেলে তার কাছ থেকে?'

'পেলাম—' ব্যোমকেশ ঘুরন্ত পাখার পানে চাহিয়া হাসিল, 'একটা প্রীতি-উপহার।'

'প্রীতি-উপহার!'

'হ্যাঁ। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে বিয়ের সময় প্রীতি-উপহার ছাপার খুব চলন ছিল, এখন কমে গেছে। ঘুড়ির কাগজের মত পিতপিতে কাগজের রুমালে লাল কালিতে ছাপা কবিতা, মাথার ওপর ডানা-মেলে-দেওয়া প্রজাপতির ছবি। দেখেছ নিশ্চয়।'

'দেখেছি। খাজাঞ্চি মশায় এই প্রীতি-উপহার তোমাকে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ওই যে পাঞ্জাবির পকেটে রয়েছে, বার করে দেখ না।'

'কিন্তু—কার বিয়ের প্রীতি-উপহার?'

'পড়েই দেখ না।'

পাঞ্জাবির পকেট হইতে প্রীতি-উপহার বাহির করিলাম। পিতপিতে কাগজে লাল কালিতে ছাপা কবিতা, উপরে মুক্তপক্ষ প্রজাপতি, এবং তাহাকে ঘিরিয়া রামধনুর আকারে লেখা আছে—কুমারী সুচিত্রার সঙ্গে ঊষাপতির শুভ পরিণয়। তারপর কবিতা। এ-কবিতা পড়িয়া মানে বুঝিতে পারে এমন দিগ্‌গজ পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই। সর্বশেষে কাব্য-রচয়িতার নাম, শ্রীধনঞ্জয় মণ্ডল ও সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্মিবৃন্দ।

বলিলাম, 'এই কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে। এ ছাড়া আর কিছু পেলে না?'

'আর কিছুর দরকার নেই। এই প্রীতি-উপহারের মধ্যে সব কিছু আছে।'

'কি আছে? আমি তো কিছু দেখছি না।'

'হায় অন্ধ! ভাল করে দেখ।'

কবিতা আবার পড়িলাম। পড়িতে খুবই কষ্ট হইল, তবু পড়িলাম। তারপর বলিলাম, 'এ-কবিতার মধ্যে যদি কোনও ইশারা ইঙ্গিত থাকে তার মানে বোঝা আমার কম্ম নয়। সুচিত্রা নিশ্চয় ঊষাপতিবাবুর স্ত্রীর নাম, তার সঙ্গে ঊষাপতিবাবুর বিয়ে হওয়াতে ধনঞ্জয় মণ্ডল এবং সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্মিবৃন্দ খুব আহ্লাদিত হয়েছিলেন, এইটুকুই আন্দাজ করছি।'

'কবিতা নয়, তারিখ—তারিখ! বিয়ের তারিখটা দেখ।'

নীচের দিকে বাঁ কোণে লেখা ছিল :

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭।

বলিলাম, 'তারিখ দেখলাম, কিন্তু অজ্ঞানমসী দূর হল না।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, 'সত্যকাম তার জন্ম-তারিখ বলেছিল, মনে আছে?'

'বলেছিল মনে আছে, কিন্তু তারিখটা মনে নেই।'

'আমার মনে আছে।'

অধীর হইয়া উঠিলাম, 'এ-সব সন-তারিখের মানে কী? সত্যকামের খুনের সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কী?'

'ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ভেবে দেখ।'

'ভেবে দেখতে পারি না। তুমি যদি বুঝে থাক কে খুন করেছে পষ্টাপষ্টি বল।'

'তুমি বুঝতে পারছ না?'

'না। কে খুন করেছে সত্যকামকে?'

'ঊষাপতিবাবু।'

'বাপ ছেলেকে খুন করেছে?'

'করলেও অন্যায় হত না, কিন্তু সত্যকাম ঊষাপতিবাবুর ছেলে নয়।'

মাথা গুলাইয়া গেল, কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া রহিলাম। তারপর সত্যবতী ভিতরের দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া বলিল, 'হ্যাঁগা, আজ কি তোমাদের উপোস?

অপরাহ্ণে চারটের সময় আবার উষাপতিবাবু আসিলেন। এবারও অনাহূত আসিয়াছেন। সকালবেলার ক্লান্ত বিষণ্ণতা আর নাই, চক্ষে সতর্ক তীক্ষ্ণতা। তিনি আসিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে বসিলেন, কিছুক্ষণ শ্যেনদৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'আপনি ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ?'

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'কী জানতে গিয়েছিলেন ?'

'যা জানতে গিয়েছিলাম তা জানতে পেরেছি।'

'কী জানতে গিয়েছিলেন ?'

'সবই জানতে পেরেছি, উষাপতিবাবু। এমন কি দোরে আঁটা রাংতার চাকতির তত্ত্বও অজানা নেই।'

উষাপতিবাবুর প্রশ্নের তীব্রতা যেন ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল। তিনি আবার খানিকক্ষণ ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর সংবৃত স্বরে বলিলেন, 'যা জানতে পেরেছেন তা আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার বিয়ের তারিখ আর সত্যকামের জন্মের তারিখ ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করা যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইনি, উষাপতিবাবু। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম। সত্যকাম আমাকে বলেছিল তার মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে, আসামীকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার কোনও দায়িত্ব আমার নেই।'

উষাপতিবাবু স্থিরনেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্তন হইল। এতক্ষণ তিনি যে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, এখন সহসা অস্ত্র নামাইলেন। অবিশ্বাস-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, 'আপনি যা জানতে পেরেছেন পুলিসকে তা বলবেন না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, পুলিস আমার সাহায্য চায় না, আমি কেন গায়ে পড়ে তাদের সাহায্য করতে যাব ?'

উষাপতিবাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দুই হাতে রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার শরীর দুই তিনবার অবরুদ্ধ আবেগে ঝাঁকানি দিয়া উঠিল। তারপর তিনি যখন মুখ খুলিলেন, তখন দেখিলাম তাঁহার মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মরণাপন্ন রোগী প্রথম আরোগ্যের আশ্বাস পাইলে তাহার মুখে যে ভাব ফুটিয়া ওঠে উষাপতিবাবুর মুখেও সেই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি আরও কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, তারপর ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, সত্যকামের মৃত্যু কেন দরকার হয়েছিল আপনি শুনবেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনব। আপনি সব কথা বলুন।'

উষাপতিবাবু একবার কাতর চক্ষে আমার পানে চাহিলেন। তাঁহার চাহনির অর্থ: ব্যোমকেশের কাছে তিনি নিজের মর্ম-কথা বলিতে রাজী থাকিলেও আর কাহারও সম্মুখে বলিতে অনিচ্ছুক। ব্যোমকেশ তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া আমাকে বলিল, 'অজিত, তুমি একবার হাওড়া স্টেশনে যাও, এন্‌কোয়ারি অফিস থেকে জেনে এস কাশ্মীর যাওয়ার ব্যবস্থা কী রকম। কাশ্মীরে গণ্ডগোল চলছে, আগে থাকতে খবরাখবর নিয়ে রাখা ভাল।'

মনে মনে একটু নিরাশ হইলাম, তারপর জামা কাপড় বদলাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

হাওড়া স্টেশনের কাজ সারিয়া যখন ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সদর দরজা ভেজানো ছিল, প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উষাপতিবাবু চলিয়া গিয়াছেন, ছায়াচ্ছন্ন ঘরের অপর প্রান্তে জানালার সামনে চেয়ার টানিয়া সত্যবতী ও ব্যোমকেশ ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছে। জানালা দিয়া ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া সত্যবতী একটু সরিয়া বসিল।

আমি কাছে আসিয়া বলিলাম, 'বেশ তো কপোত-কপোতীর মত বসে মলয় মারুত সেবন করছ। —খোকা কোথায় ?'

সত্যবতী একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, 'পুঁটিরাম খোকাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখ অজিত, কবিদের কথা মিছে নয়। তাঁরা যে বসন্তঋতুর সমাগমে ক্ষেপে ওঠেন, তার যথেষ্ট কারণ আছে। মলয় মারুতে যুবক যুবতীরাই বেশি ঘায়েল হয় বটে কিন্তু বয়স্থ ব্যক্তিরাও বাদ পড়েন না। আমার বিশ্বাস, এটা যদি বসন্তকাল না হত তাহলে উষাপতিবাবু সত্যকামকে খুন করতেন কিনা সন্দেহ।'

বলিলাম, 'বল কি ! বসন্তকালের এমন মারাত্মক শক্তির কথা কবিরা তো কিছু লেখেননি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পষ্ট না লিখলেও ইশারায় বলেছেন। শক্তিমাত্রেই মারাত্মক ; যে আগুন আলো দেয় সেই আগুনই পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। —কিন্তু যাক, কাশ্মীরের খবর কী বল।'

বলিলাম, 'কাশ্মীরে লড়াই বেধেছে, সাধারণ লোককে যেতে দিচ্ছে না। যেতে হলে ভারত সরকারের পারমিট চাই।'

আমি একটা চেয়ার আনিয়া ব্যোমকেশের অন্য পাশে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'পারমিট যোগাড় করা শক্ত হবে না। ভারত সরকারের সঙ্গে এখন আমার গভীর প্রণয়, অন্তত যতদিন বল্লভভাই প্যাটেল বেঁচে আছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, সবাই মিলে কাশ্মীর যাওয়া কি ঠিক হবে ? খোকা সবেমাত্র স্কুলে ঢুকেছে, গরমের ছুটিরও দেরি আছে। ওকে স্কুল কামাই করিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত মনে হচ্ছে না।'

সত্যবতী বলিল, 'খোকা যাবে কেন ? খোকা বাড়িতে থাকবে। ঠাকুরপো, তুমি খোকার দেখাশুনা করতে পারবে না ?'

আমি কিছুক্ষণ সত্যবতীর পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'ও—এই মতলব। তোমরা দুটিতে হংস-মিথুনের মত কাশ্মীরে উড়ে যাবে, আর আমি খোকাকে নিয়ে বাসায় পড়ে থাকব। ভাই ব্যোমকেশ, তুমি ঠিক বলেছ, বসন্তঋতু বড় মারাত্মক ঋতু। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। যাও তোমরা টো টো করে বেড়াও গে, আমি খোকাকে নিয়ে মনের আনন্দে থাকব। সত্যি কথা বলতে কি, কাশ্মীর যাবার ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। বাংলাদেশই আমার ভূ-স্বর্গ—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিলাম।

সত্যবতী ঠোঁটের উপর আঁচল চাপা দিয়া হাসি গোপন করিল। ব্যোমকেশ মৃদু গুঞ্জনে কবিতা আবৃত্তি করিল, 'যৌবন মধুর কাল, আও বিনাশিবে কাল, কালে পিও প্রেম-মধু করিয়া যতন। —একটা সিগারেট দাও।'

সিগারেট দিয়া বলিলাম, 'কবিতা পড়ে পড়ে তোমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ও-কথা এখন থাক, উষাপতি যে নিজের চরিতামৃত শুনিয়ে গেলেন তা বলতে বাধা আছে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছুমাত্র না। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলাম। তোমাদের

দু'জনেই শোনাতে চাই। বড় মর্মান্তিক কাহিনী।'

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল—

'সত্যকাম আমার কাছে এসেছিল এক আশ্চর্য প্রস্তাব নিয়ে—আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় আপনি অনুসন্ধান করবেন। সে জানত কে তাকে খুন করতে চায়, কিন্তু তার নাম আমাকে বলল না। তখনই আমার মনে প্রশ্ন জাগল—নাম বলতে চায় না কেন? এখন জানতে পেরেছি, নাম না বলার গুরুতর কারণ ছিল, পারিবারিক কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ত। সে যে জারজ, তার মা যে কলঙ্কিনী, এ-কথা সে প্রকাশ করতে পারেনি; নিজের মুখে নিজের কলঙ্ক-কথা কটা লোক প্রকাশ করতে পারে? সবাই তো আর সত্যযুগের সত্যকাম নয়।

'তবু একটা ইঙ্গিত সে আমাকে দিয়ে গিয়েছিল—তার জন্ম-তারিখ। কিন্তু এমনভাবে দিয়েছিল যে, একবারও সন্দেহ হয়নি তার জন্ম-তারিখের মধ্যেই তার মৃত্যু-রহস্যের চাবি আছে। সে জানত, আমি যদি অনুসন্ধান আরম্ভ করি তাহলে জন্ম-তারিখটা আমার কাজে লাগবে। সত্যকাম বিবেকহীন লম্পট ছিল, কিন্তু তার বুদ্ধির অভাব ছিল না।

'এবার গোড়া থেকে গল্পটা বলি। সত্যকামের জন্মের আগে থেকে সে-গল্পের সূত্রপাত। উষাপতিবাবুর মুখেই এ-গল্পের বেশির ভাগ শুনেছি, তবু গল্পটা যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। তিনি নিজেকে রেয়াত করেননি, নিজের দোষ দুর্বলতা অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রমাকান্ত চৌধুরী সুচিত্রা এম্পোরিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। রমাকান্ত চৌধুরীর একমাত্র মেয়ের নাম সুচিত্রা, মেয়ের নামেই দোকানের নাম। চৌধুরী মশায় ভারী চতুর ব্যবসাদার ছিলেন, দু'-চার বছরের মধ্যেই তাঁর দোকান ফেঁপে উঠল। ধর্মতলায় নতুন বাড়ি তৈরি হল, জমজমাট ব্যাপার। চৌধুরী মশায়ের সুচিত্রা এম্পোরিয়ম বিলাতি দোকানের সঙ্গে টেক্কা দিতে লাগল।

'উষাপতি দাস ১৯২৫ সনে সামান্য শপ-অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি নিয়ে সুচিত্রা এম্পোরিয়মে ঢোকেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বাইশ; গরীবের ঘরের বাপ-মা-মরা ছেলে, লেখাপড়া বেশি শেখেননি। কিন্তু চেহারা ভাল, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। দু'-চার দিনের মধ্যেই তিনি দোকানের মাল বিক্রি করার কায়দাকানুন শিখে নিলেন, খদ্দেরকে কী করে খুশি রাখতে হয় তার কৌশল আয়ত্ত করে ফেললেন। সহকর্মীদের মধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ক্রমে স্বয়ং কর্তার সুনজর পড়ল তাঁর ওপর। দু'-চার টাকা করে মাইনে বাড়তে লাগল।

'দু'-বছর কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন উষাপতিবাবুর চরম ভাগ্যোদয় হল। রমাকান্ত চৌধুরী তাঁকে নিজের অফিস-ঘরে ডেকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই।' এ-প্রস্তাব উষাপতির কল্পনার অতীত, তিনি যেন চাঁদ হাতে পেলেন। সেই যে রূপকথা আছে, পথের ভিখিরির সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে, এ যেন তাই। সুচিত্রাকে উষাপতি আগে অনেকবার দেখেছেন, সুচিত্রা প্রায়ই দোকানে আসতেন। ভারী মিষ্টি নরম চেহারা। উষাপতির মন রোমান্সের গন্ধে ভরে উঠল।

'মাসখানেকের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। খুব ধুমধাম হল। উষাপতির সহকর্মীরা প্রীতি-উপহার ছেপে বন্ধুকে অভিনন্দন জানালেন। উষাপতিবাবু এতদিন তাঁর বিবাহিতা বোনের বাড়িতে থাকতেন, এখন শ্বশুরবাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ি। রমাকান্ত চৌধুরী বড়মানুষ, তায় বিপত্নীক; তিনি মেয়েকে কাছ-ছাড়া করতে চান না।

'টোপের মধ্যে বঁড়শি আছে উষাপতি তা টের পেলেন ফুলশয্যার রাত্রে। রূপকথার স্বপ্ন-ইমারত ভেঙে পড়ল; বুঝতে পারলেন সুচিত্রা এম্পোরিয়মের কর্তা কেন দীনদরিদ্র

কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ফুলের বিছানায় শয়ন করা হল না, উষাপতিবাবু সারা রাত্রি একটা চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলেন। সকালবেলা শ্বশুরকে গিয়ে বললেন—আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এবার আমাকে বিদায় দিন।

'রমাকান্ত চৌধুরী ঘড়েল ব্যবসাদার, তিনি বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন ; মোলায়েম সুরে জামাইকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন—সুচিত্রা ছেলেমানুষ, মা-মরা মেয়ে ; তার ওপর আজকাল দেশে যে হাওয়া বইতে শুরু করেছে তাতে মেয়েদের সামলে রাখাই দায়। সুচিত্রা খুবই ভাল মেয়ে, কেবল বর্তমান আবহাওয়ার দোষে একটু ভুল করে ফেলেছে। আজকাল ঘরে ঘরে এই ব্যাপার হচ্ছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়, কিন্তু বাইরের লোক কি জানতে পারে ? সবাই বৌ নিয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করে। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে নিজের মুখেই চুন-কালি পড়বে। অতএব—

'উষাপতি কিন্তু কথায় ভুললেন না, বললেন, 'আমায় মাপ করুন, আমি গরীব বটে কিন্তু সদ্‌বংশের ছেলে। আমি পারব না।'

'কথায় চিঁড়ে ভিজল না দেখে রমাকান্ত চৌধুরী ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। দেরাজ থেকে ইস্টাম্বরি কাগজে লেখা দলিল বার করে বললেন, 'আজ থেকে সুচিত্রা এম্পোরিয়মের তুমি আট আনা অংশীদার। এই দেখ দলিল। আমি মরে গেলে আমার যা কিছু সব তোমরাই পাবে, আমার তো আর কেউ নেই। কিন্তু আজ থেকে তুমি আমার পার্টনার হলে। দোকানে আমার হুকুম যেমন চলে তোমার হুকুমও তেমনি চলবে।'

'উষাপতির মাথা ঘুরে গেল। রাজকন্যাটি দাগী বটে কিন্তু হাতে হাতে অর্ধেক রাজত্ব। মোট কথা উষাপতি শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন, সদ্য সদ্য অত টাকার লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি শ্বশুরবাড়িতে থাকতে রাজী হলেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক রইল না। সেই যে ফুলশয্যার রাত্রে দু'-চারটে কথা হয়েছিল, তারপর থেকে কথা বন্ধ ; শোবার ব্যবস্থাও আলাদা। বাইরের লোকে অবশ্য কিছু জানল না, ধোঁকার টাটি বজায় রইল।

'রমাকান্ত যে বলেছিলেন সুচিত্রা ভাল মেয়ে, সে-কথা নেহাত মিথ্যে নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঁধন ভাঙার একটা ঢেউ এসেছিল, উচ্চবিত্ত সমাজের অবাধ মেলা-মেশা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুচিত্রা আলোর নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে একটু বেশি মাতামাতি করেছিলেন। অভিভাবিকার অভাবে গণ্ডীর বাইরে যে পা দিচ্ছেন তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তাঁর হুঁশ হল। বিয়ের পর তিনি বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন, শান্ত সংযতভাবে বাড়িতে রইলেন। রমাকান্তের বাড়িতে লোক কম, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, কেবল রমাকান্ত, সুচিত্রা আর উষাপতি। স্থায়ী চাকরের মধ্যে সহদেব, আর বাকী ঝি-চাকর ঠুকো। সহদেব চাকরটার বুদ্ধিসুদ্ধি বেশি নেই, কিন্তু অটল তার প্রভু-পরিবারের প্রতি ভক্তি। তাই ঘরের কথা বাইরে চাউর হতে পেল না।

'বিয়ের মাস দেড়েক পরে রমাকান্ত মেয়েকে নিয়ে বিলেত গেলেন। ওজুহাত দেখালেন, মেয়ের শরীর খারাপ, তাই চিকিৎসার জন্যে বিলেতে নিয়ে যাচ্ছেন। উষাপতি দোকানের সর্বময় কর্তা হয়ে কাজ চালাতে লাগলেন।

'প্রায় এক বছর পরে রমাকান্ত বিলেত থেকে ফিরলেন। সুচিত্রার কোলে ছেলে। ছেলে দেখে বোঝা যায় না তার বয়স দু'-মাস কি পাঁচ মাস...

'তারপর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে উষাপতিবাবুর নীরস প্রাণহীন জীবনযাত্রা আরম্ভ হল। স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, শ্বশুরের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ। দোকানটিকে উষাপতি প্রাণ দিয়ে

ভালবাসলেন। তবু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? অন্তরের মধ্যে ক্ষুধিত যৌবন হাহাকার করতে লাগল। ওদিকে সুচিত্রা সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে উষাপতি তাঁকে দেখতে পান, মনে হয় সুচিত্রা যেন কঠোর তপস্বিনী। তাঁর মনটা কোমল হয়ে আসে, তিনি জোর করে নিজেকে শক্ত রাখেন।

'একটি একটি ঘরে বছর কাটিতে থাকে। সত্যকাম বড় হয়ে উঠতে লাগল। লম্পট বাপের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত তার শরীরে, তার যত বয়স বাড়তে লাগল রক্তের দাগও তত ফুটে উঠতে লাগল। সব রকম রক্তের দাগ মুছে যায়, এ-রক্তের দাগ কখনও মোছে না। সত্যকাম কারুর শাসন মানে না, নিজের যা ইচ্ছে তাই করে; কিন্তু ভয়ানক ধূর্ত সে, কুটিল তার বুদ্ধি। দাদামশায়কে সে এমন বশ করেছে যে সব জেনেশুনেও তিনি কিছু বলতে পারেন না। সুচিত্রা শাসন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। উষাপতি সত্যকামের কোনও কথায় থাকেন না, সব সময় নিজেকে আলাদা করে রাখেন...স্ত্রীর কানীন পুত্রকে কোনও পুরুষই স্নেহের চক্ষে দেখতে পারে না। সত্যকামের স্বভাব চরিত্র যদি ভাল হত তাহলে উষাপতি হয়তো তাকে সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু এখন তাঁর মন একেবারে বিষিয়ে গেল। সুচিত্রার সঙ্গে উষাপতির একটা ব্যবহারিক সংযোগের যদি বা কোনও সম্ভাবনা থাকত তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। উষাপতি আর সুচিত্রার মাঝখানে সত্যকাম ফণি-মনসার কাঁটা-বেড়ার মত দাঁড়িয়ে রইল।

'সত্যকামের যখন উনিশ বছর বয়স, তখন রমাকান্ত মারা গেলেন, সত্যকামকে নিজের অংশ উইল করে দিয়ে গেলেন। এই সময় সত্যকাম নিজের জন্ম-রহস্য জানতে পারল। বিলেতে তার জন্ম হয়েছিল, সুতরাং বার্থ-সার্টিফিকেট ছিল। দাদামশায়ের কাগজপত্রের মধ্যে সেই বার্থ-সার্টিফিকেট বোধহয় সে পেয়েছিল, তারপর পারিবারিক পরিস্থিতি দেখে আসল ব্যাপার বুঝে নিয়েছিল। সে বাইরে ভারী কেতাদুরস্ত ছেলে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীষণ কুটিল আর হিংসুক। উষাপতি আর সুচিত্রার প্রতি তার ব্যবহার হিংস্র হয়ে উঠল। একদিন সে নিজের মাকে স্পষ্টই বলল, 'তুমি আমাকে শাসন করতে আস কোন লজ্জায়। আমি সব জানি।' উষাপতিকে বলল, 'আপনি আমার বাপ নন, আপনাকে খাতির করব কিসের জন্যে?'

'বাড়িতে উষাপতি আর সুচিত্রার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল। ওদিকে দোকানে গিয়ে সত্যকাম আর-একরকম খেলা দেখাতে আরম্ভ করল। সে এখন দোকানের অংশীদার, উষাপতির সঙ্গে তার অধিকার সমান। সে নিজের অধিকার পুরোদস্তুর জারি করতে শুরু করল। সুচিত্রার মত শৌখিন দোকানে পুরুষের চেয়ে মেয়ে খদ্দেরেরই ভিড় বেশি; সত্যকাম তাদের মধ্যে থেকে কমবয়সী সুন্দর মেয়ে বেছে নিত, তাদের সঙ্গে ভাব করত, দোকানের দামী জিনিস সস্তায় তাদের বিক্রি করত, হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়াত। দোকানের তহবিল থেকে যখন যত টাকা ইচ্ছে বার করে দু'-হাতে ওড়াত। মদ, ঘোড়দৌড়, বড় বড় ক্লাবে গিয়ে জুয়া খেলা তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবসা হয়ে উঠল।

'রমাকান্তর মৃত্যুর পর বছরখানেক যেতে না যেতেই দেখা গেল দোকানের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে, আর বেশি দিন এভাবে চলবে না। উষাপতিবাবু বাধা দিতে গেলে সত্যকাম বলে, 'আমার টাকা আমি ওড়াচ্ছি, আপনার কী?' উপরন্তু দোকানের একটা বদনাম রটে গেল, মেয়েদের ও-দোকানে যাওয়া নিরাপদ নয়। খদ্দের কমে যেতে লাগল। বিভ্রান্ত উষাপতিবাবু কী করবেন ভেবে পেলেন না।

'পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তখন একটি ব্যাপার ঘটল। একদিন সন্ধ্যার

পর কী একটা কাজে উষাপতি বাড়িতে এসেছেন, ওপরে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেলেন পাশের ঘর থেকে একটা অবরুদ্ধ কাতরানি আসছে। পাশের ঘরটা তাঁর স্ত্রীর ঘর। পা টিপে টিপে উষাপতি দোরের কাছে গেলেন। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী একলা মেঝেয় মাথা কুটছেন আর বলছেন, 'এখনো কি আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি ? আর যে আমি পারি না !'

'উষাপতি চুপি চুপি নীচে নেমে গেলেন। সহদেবকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সন্ধ্যার আগে পাড়ার একটি বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, তিনি সুচিত্রাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেছেন। মহিলাটির মেয়েকে নাকি সত্যকাম সিনেমা দেখাচ্ছে আর বিলিতি হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছে।

'সেই দিন উষাপতি সংকল্প করলেন, সত্যকামকে সরাতে হবে। তাকে খুন না করলে কোনও দিক দিয়েই নিস্তার নেই। এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

'উষাপতি তৈরি হলেন। তাঁর একটা সুবিধে ছিল, সত্যকাম যদি খুন হয় তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না। বাইরে সবাই জানে সত্যকাম তাঁর ছেলে, বাপ ছেলেকে খুন করেছে এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সত্যকামের অনেক শত্রু; সন্দেহটা তাদের উপর পড়বে। তবু এমনভাবে কাজ করা দরকার, যাতে কোনও মতেই তাঁর পানে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়।

'উষাপতি একটি চমৎকার মতলব বার করলেন। একজন চেনা গুণ্ডার কাছ থেকে একটি রিভলভার যোগাড় করলেন। ছেলেবেলায় কিছুদিন তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দলে মিশেছিলেন, রিভলভার চালানোর অভ্যাস ছিল ; তিনি কয়েকবার বেলঘরিয়ার একটা আম-বাগানে গিয়ে অভ্যাসটা ঝালিয়ে নিলেন। তারপর সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'সত্যকাম ঝানু ছেলে, সে উষাপতির মতলব বুঝতে পারল ; কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার কোনও উপায় খুঁজে পেল না। পুলিসের কাছে গেলে নিজের জন্ম-রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে হতাশ হয়ে আমার কাছে এসেছিল। উষাপতিবাবু অবশ্য সে-খবর জানতেন না।

'যে-রাত্রে সত্যকাম খুন হয়, সে-রাত্রিটা ছিল শনিবার। শনিবারে সত্যকাম অন্য রাত্রির চেয়ে দেরি করে বাড়ি ফেরে, সুতরাং শনিবারই প্রশস্ত। উষাপতিবাবু একটি রাংতার চাকতি তৈরি করে রেখেছিলেন ; রাত্রি সাড়ে দশটার সময় যখন সহদেব রান্নাঘরে খেতে গিয়েছে, তখন তিনি চুপি চুপি নেমে এসে সেটি দরজার কপাটে জুড়ে দিয়ে আবার নিঃশব্দে উপরে উঠে গেলেন। সদর দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ রইল, বাহিরে যে রাংতার চাকতি সাঁটা হয়েছে তা কেউ জানতে পারল না। গুকো ঝি আর রাঁধুনি তার অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছে।

'সহদেব খাওয়া-দাওয়া শেষ করে খিড়কির দরজায় তালা লাগাল, তারপর সদর বারান্দায় গিয়ে বিছানা পেতে শুল। ওপরে উষাপতিবাবু নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন, সামনের দিকের ব্যালকনির দরজা খুলে রাখলেন।

'দু'-ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ফটকের কাছে শব্দ হল, সত্যকাম আসছে। উষাপতি ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসে ঘাপটি মেরে রইলেন। ফটক থেকে সদর দরজা পর্যন্ত রাস্তা অন্ধকার, সত্যকাম টর্চ জ্বেলে দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে। সদর দরজায় টোকা মেরে হঠাৎ তার নজরে পড়ল দরজার নীচের দিকে টাকার মত একটা চাকতি টর্চের আলোয় চক্‌চক্ করছে। সে সামনের দিকে ঝুঁকে সেটা দেখতে গেল। অমনি উষাপতিবাবু ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে গুলি করলেন। রিভলভারের গুলি সত্যকামের পিঠ ফুটো করে বুকের হাড়ে গিয়ে আটকাল। সত্যকাম সেইখানেই মুখ থুবড়ে পড়ল, হাতের জ্বলন্ত টর্চটা জ্বলতেই রইল।

'এই হল সত্যকামের মৃত্যুর প্রকৃত ইতিহাস। উষাপতিবাবু এমন কৌশল করে ছিলেন যে, লাশ পরীক্ষা করে মনে হবে পিছন দিক থেকে কেউ তাকে গুলি করেছে, ওপর দিক থেকে গুলি করা হয়েছে তা কিছুতেই বোঝা যাবে না। রাংতার চাকতিটা যদি না থাকত আমিও বুঝতে পারতাম না।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। আমরাও অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সত্যবতী বলিল, 'তুমি প্রথম কখন উষাপতিবাবুকে সন্দেহ করলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, বাড়ির লোকের কাজ। যদি বাইরের লোকের কাজ হবে, তাহলে সত্যকাম হত্যাকারীর নাম বলবে না কেন? তখনই আমার মনে হয়েছিল এই সংকল্পিত হত্যার পিছনে এক অতি গুহ্য পারিবারিক কলঙ্ক-কাহিনী লুকিয়ে আছে।

'তারপর জানতে পারলাম, উষাপতি আর সুচিত্রার দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক নয়। দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ, শোবার ঘরও আলাদা। মনে খটকা লাগল। খাজাঞ্চি মশায়ের সঙ্গে আলাপ জমালাম। লোকটি উষাপতিবাবুর দরদী বন্ধু; তিনিই একুশ বছর আগে বন্ধুর বিয়েতে প্রীতি-উপহার লিখেছিলেন। প্রীতি-উপহারটি খাজাঞ্চি মশাই খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, কারণ এটি তাঁর প্রথম এবং একমাত্র কবি-কীর্তি। আমি যখন প্রীতি-উপহারটি হাতে পেলাম, তখন আর কোনও সংশয় রইল না। সত্যকামের জন্ম-তারিখ মনে ছিল—৭ই জুলাই, ১৯২৭। আর বিয়ের তারিখ ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭। অর্থাৎ বিয়ের পর পাঁচ মাস পূর্ণ হবার আগেই ছেলে হয়েছে। ধূর্ত রমাকান্ত কেন দরিদ্র কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বুঝতে কষ্ট হয় না।

'সত্যকাম উষাপতির ছেলে নয়, সুতরাং তাকে খুন করার পক্ষে উষাপতির কোনও বাধা নেই। কিন্তু তিনি খুন করলেন কী করে? যখন জানতে পারলাম মৃত্যুকালে সত্যকামের হাতে জ্বলন্ত টর্চ ছিল, তখন এক মুহূর্তে রাংতার চাকতির উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সত্যকামের টর্চের আলো দোরের ওপর পড়েছিল, রাংতার চাকতিটা চক্‌মক্ করে উঠেছিল, সত্যকাম সামনে ঝুঁকে দেখতে গিয়েছিল ওটা কি চক্‌মক্ করছে। ব্যস্—!'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। আমি ব্যোমকেশকে সিগারেট দিয়া নিজে একটা লইলাম, দু'জনে টানিতে লাগিলাম। ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দখিনা বাতাস চুপি চুপি আমাদের ঘিরিয়া খেলা করিতেছে।

হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ উষাপতিবাবু যাবার সময় আমার হাত ধরে বললেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমি আর আমার স্ত্রী জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছি, একুশ বছর ধরে শ্মশানে বাস করেছি। আজ আমরা অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চাই, একটু সুখী হতে চাই। আপনি আর জল ঘোলা করবেন না।' আমি উষাপতিবাবুকে কথা দিয়েছি, জল ঘোলা করব না। কাজটা হয়তো আইনসঙ্গত হচ্ছে না। কিন্তু আইনের চেয়েও বড় জিনিস আছে—ন্যায়ধর্ম। তোমাদের কী মনে হয়? আমি অন্যায় করেছি?'

সত্যবতী ও আমি সমস্বরে বলিলাম, 'না।'